মানব সভ্যতা

(মধ্যযুগ)

ডঃ সঙ্ঘমিত্রা দাশগুপ্ত

Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education as a Text Book for Class VII *vide Notification No. T. B. No. VII/H/81/43 dated 8.1.81*

মানব সভ্যতা

(মধ্যযুগ)

[সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্য]

সঙ্ঘমিত্রা দাশগুপ্ত, এম. এ., পি-এইচ. ডি,
শিক্ষিকা, সাউথ পয়েণ্ট স্কুল, কলিকাতা

৯ এ্যাণ্টনি বাগান লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশক ঃ
এ. সাহা
পুথিপত্র
৯ এ্যান্টনি বাগান লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

বিক্রয়কেন্দ্র ঃ
পুথিপত্র
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

[সরকারী আনুকূল্যে প্রাপ্ত স্বল্পমূল্যের কাগজে মুদ্রিত]

প্রথম সংস্করণ ঃ মে, ১৯৮০
দ্বিতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর, ১৯৮০
তৃতীয় সংস্করণ ঃ জানুয়ারি, ১৯৮১
চতুর্থ সংস্করণ, ডিসেম্বর, ১৯৮১
পুনর্মুদ্রণ, ডিসেম্বর, ১৯৮৩
পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারি, ১৯৮৪
পঞ্চম সংস্করণ, জানুয়ারি, ১৯৮৫
ষষ্ঠ সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৬

মূল্য ঃ দশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীমতী অঞ্জলি মুখার্জী
সারদা আর্ট প্রেস
১৩/১ বলাই সিংহ লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

ভূমিকা

পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের নতুন পাঠক্রম অনুসারে সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এই বই লেখা হয়েছে।

নতুন পাঠক্রমে মানবসভ্যতার বিবর্তনের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। এর খুবই প্রয়োজন ছিল, যেহেতু বর্তমান সভ্যতার স্বরূপ উপলব্ধির জন্য মানব ইতিহাসের বিবর্তনের ধারার সঙ্গে পরিচিতি আবশ্যিক। ইতিহাস সমাজ জীবনের সামগ্রিক চিত্র। এ কারণে সমাজ পরিবর্তনের মূল সূত্রগুলিকে আমি এ বইয়ে প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করেছি। এ ছাড়া মধ্যযুগের সকল স্তরের মানুষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থা, শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্যের অগ্রগতি আলোচ্য পুস্তকে বিশদভাবে বর্ণিত। পুস্তকে ব্যবহৃত চিত্রাবলী ও মানচিত্র বিষয়বস্তুর যাথার্থ্য বোধের সহায়ক। প্রত্যেক পরিচ্ছেদের সুচিন্তিত প্রশ্নাবলী ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা প্রস্তুতির জন্য সহায়ক হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

পরিশেষে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অজয়কুমার ব্যানার্জি, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত এবং সহৃদয় অপর যে-সমস্ত ব্যক্তি আমাকে এই পুস্তক রচনায় অকৃপণ সহায়তা করেছেন, তাঁদের সকলকেই আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

সঙ্ঘমিত্রা দাশগুপ্ত

SYLLABUS

HISTORY OF MEDIEVAL CIVILISATIONS

	Pages	*Lessons*
1. Meaning of the term 'Medieval'	3	3

(a) From overthrow of the last Roman Emperor in 476 A. D. to the rise of new society, new state, new learning, new economic patterns.

(b) In India—from the end of the Gupta Era (although 'Feudal' relations had started from the 5th century).

(c) The time period in both cases—roughly 5th century to 15th century A. D.

(d) Periodisation is arbitrary because of gradual transition, in some respect the old merging into the middle ages.

(e) Middle ages—not the same period everywhere.

(f) No single pattern. Unequal and varied developments.

2. The Middle Ages in the West	5	3

(a) Advent, pressure of the Huns upon Germanic Tribes—their migration into the Western part of the Roman Empire—fall of the Empire (476 A. D.) Survival of Roman Law and Roman idea of imperial unity.

(b) A short reference to Alaric, Atilla, Ganeseric.

(c) Social, political and religious life of the migrants, (a brief account only of) their settlements in the imperial territories—mix-up with Roman population. Christian influence upon the settlers.

3. The myth of 'dark ages' in Europe	3	3

4th to 7th century—not 'dark' learning was kept alive in monasteries-ecclesiastical concept of right and wrong functioned as a civilising influence :

4. The Byzantne Civilisation	7	5

(a) Constantine founds Constantinople and makes Christianity the official religion of Byzantium.

(b) Justinian's efforts to establish unified empire (without details about wars). Justi-

Pages Lessons

nian's Law Code, its importance ; partronage of architecture and painting.

(c) Importance of Byzantium as a centre of trade and commerce, preserver of Culture, Literature, Philosophy, Science).

5. Islam and its impact : 7 5

(a) The Arabs—land and people. The prophet and his teachings ; Factors which facilitated the spread of Islam : The Caliphs, the Arab empire. Cordova ; How Europe reacted to the achievements of Islam ; Arab contributions to culture, arts and Sciences, scholarship. Some scholars.

6. Western Europe in Medieval Period (800-1200 A. D. approx.) : 10 8

(a) Charlemagne—revival of the Holy Roman Empire (800 A. D.) Importance of Coronation—relation between State and Church, —Court and its patronage of art and literature.

(b) Monasteries—monks and nuns—life centring round monasteries (Benedictive vows) the role of monasteries in the preservation and dissemination of learning—Cluny (Freeing the Church from corruption, secularisation and feudalisation).

(c) Investiture issue (Reference only).

(d) 11th and 12th centuries : from monastic and cathedral schools Universities—some famous scholars, students and teacher relationship. The growth of studies in Law, Medicine, Theology, as well as logic, liberal arts, literature.

7. Feudalism in Medieval Europe : 16 10

(a) Feudalism : Land—the bond between man and man ; The Feudal hierarchy ; private assumption of public authority, the role of the Feudal Castle and mailed horsemen in saving Europe ; Feudalism—a way of life ; Institution of Chivalry—Troubadours.

(b) Manorial System : Manorialism—economic aspects of Feudalism ; Manor—the local un t

Pages Lessons

of Fudal Govt. Manorial Court Economic conditions : Cultivation by labour of village community ; peasant's heavy toil and heavy rent—conditions of peasant's life. Heavy dues to Lord and Church in cash of kind. Manorial life in Castles—Three distinct classes—clergy, nobility and rest—nobility and peasants at opposite poles. Serf—a chattel of the Lord—obligatory service, hereditary serfdom ; Means of escape—joining a holy order, runing away to town for shelter, getting employed in business and industry. Rovolt.

8. The Crusades : (Ist, 3rd, 4th) — 6 — 3

Motives—Impact upon society and culture new towns and trade-centres (Italy in particular, cottage industries separated from agriculture (11th & 12th centuries).

9. Growth of Towns—Role of the Crusades

Guilds in towns—their activities—a short account of life in towns. Town autonomy by royal charter ; origin of the term 'Bourgeois'.

10. The Far East in the Middle Ages : — 10 — 8

(i) China in Medieval Period (from early 7th century to 14th century).

(a) The T'ang period (618-907 A.D.) Reunification of China and recasting the laws ; Education, learning, literature (poetry) ; Tea, printing, arts.

Promotion of trade, commerce and agriculture—Buddhism in China. Chinese civilisation spread to Japan. Korea, Annam. China—a model for emulation.

Hiuen Tsang's visit to India and his return —impact.

(b) The Sung period (960-1280)—Important experiments—State control of Commerce, State loan to farmers, property Tax—Education and Culture.

(c) The Yuan period (1280-1368) : The Mongols : Kublai Khan (Tibetan Buddhism), and the account of Marcopolo.

Pages Lessons

Hiuen Tsang's evidence); Tibet (Atisa Dipankar)

By Sea-Settlements and cultural influence in South East Asia Subarnabhumi-Yashodharpur and Angkorvat, Angkorthom—Malay, Java—Barobudur.

13. The Sultans of Delhi (1206 to 1526 A.D.) 6 3

Coming of Turko-Afghans to India (only a brief reference to the motive and manner of their coming);

Main features of political, social and economic life; Mutual influence of Hinduism and Islam; liberal developments in Arts and Culture, translation of classics Bhakti Cult (the medieval Saints) – Shri Chaitanya,. Nanak and Kabir.

Bengal—Social, cultural and economic conditions in Ilias Shah and Hussain Shah's periods. Short account of the general administrative system.

14. Towards the end of the Medieval era (14th & 15th centuries.)

Fall of Constantinople : its impact on the Renaissance which had already started in the west.

*Features of the Renaissance era—Spirit of enquiry and reasoning, widening of frontiers of knowledge, scientific discoveries based on 'obscured facts', geographical discoveries—its outcome.

*National State – France, England, Portugal Spain, Struggle for Nation freedom (Dutch).

*Expansion of Europe.

*Old Order vs. New Order—The English revolt.

Topics with asteriks should only be used as reference, as a conclusion to the old era and introduction of a new era.

॥ সূচীপত্র ॥

প্রথম অধ্যায়

ইতিহাসে বিভিন্ন যুগ এবং মধ্যযুগের বৈশিষ্ট্য

যুগ যুগ ধরে মানুষের ইতিহাস নদীর মত বয়ে চলেছে। নদী যেমন এক একটা বাঁক নিয়ে নতুন পথে যাত্রা শুরু করে, তেমনি ইতিহাসেও এক একটি নতুন পরিবেশ বা ঘটনাবলীর সঙ্গে সংঘাতে বা তাদের প্রভাবে এক একটি নতুন যুগের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানবসভ্যতার এই বিকাশকে বলা হয় বিবর্তন। নিয়ত পরিবর্তনশীল মানবসমাজে মানুষের জীবিকা-অর্জনের উপায়, জীবন-যাত্রার প্রণালী, সমাজ বা শাসন-ব্যবস্থা বদলে যায়—সেই সঙ্গে বদলায় তাদের চিন্তাধারা আর সভ্যতার প্রকৃতি।

ইতিহাসের কাজ এই বৈচিত্র্যময় গতিপথের চিত্র তুলে ধরা। মানব-সমাজের এই ক্রমবিকাশের ইতিহাসকে ঐতিহাসিকেরা প্রধানত তিনটি কালপর্যায়ে ভাগ করেছেন: **প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ।**

প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের পতনকাল (৪৭৬ খ্রীস্টাব্দ) থেকে পঞ্চদশ খ্রীস্টাব্দে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের পতনকাল পর্যন্ত কমবেশী প্রায় হাজার বছরকে **মধ্যযুগ** বলে অভিহিত করা হয়। রোমের পতনের পর দাসতন্ত্রের বদলে সামন্ততন্ত্র নামে এক নতুন সমাজ-ব্যবস্থার সৃষ্টি ও মধ্যযুগের সূত্রপাত হল। সামন্ততন্ত্র ছিল মধ্যযুগীয় সমাজের ভিত্তি। রোমের পতন ও বর্বর জাতিদের আক্রমণের ফলে পশ্চিম ইউরোপে নিরাপত্তার অভাব দেখা দিল। তখন সামন্ত বা বড় জমিদাররা সাধারণ চাষীদের সঙ্গে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হল যে, জমিদাররা অরাজকতার হাত থেকে চাষীদের রক্ষা করবে; কিন্তু তার বদলে জমির মালিক হবে জমিদাররা এবং চাষীরা উৎপাদনের মোটা অংশ তাদের হাতে তুলে দেবে। আস্তে আস্তে নানারকম কারুশিল্পের সৃষ্টি হল। এই শিল্পীরাও এ যুগে সামন্তদের প্রভুত্ব মেনে নিয়ে তাদের আশ্রয়ে বাস করত। এই সামন্তরা কেবল নিজের এলাকার শান্তি বজায় রাখত না, তারা রাজাকেও যুদ্ধের সময় সৈন্য যোগাত। ইউরোপে এ সময়ে খ্রীস্টীয় যাজকরা খুব প্রভাবশালী ছিলেন। রাজার ক্ষমতা ছিল সীমাবদ্ধ। রাজা, সামন্তপ্রভু ও ধর্মযাজকরা ছিলেন সমাজের উপরের

স্তরের মানুষ। কৃষক, শ্রমিক ও কারিগররা এঁদের অধীনস্থ ছিল। দারিদ্র্য ও অনটনের মধ্যে নীচের তলার লোকদের দিন কাটাতে হত। সামন্ততন্ত্রকে কেন্দ্র করে মধ্যযুগীয় ইউরোপীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এই সময়ে বহু মনীষী জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তবে তাঁরা বেশীর ভাগ সময় ধর্মীয় তত্ত্ব ব্যাখ্যায় অতিবাহিত করতেন। শিল্প ও ভাস্কর্য মূলত ধর্মীয় বিষয়কে অবলম্বন করে রচিত হয়েছিল।

ভারতের মধ্যযুগ ঃ গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন থেকে ভারতে সামন্ততন্ত্রের সূচনা হয়, যদিও সামন্ততন্ত্রের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আগেই সমাজ ও অর্থনীতিতে প্রবেশ করেছিল। শক্তিশালী সাম্রাজ্যের অভাব রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ডেকে আনল। সমাজ অনুদার হল এবং কৃষির উপর অর্থনীতির নির্ভরতা বৃদ্ধি পেল। রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ অনুকূল না থাকায় আভ্যন্তরীণ এবং বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ কমে গেল। ধীরে ধীরে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী সঙ্কীর্ণ হয়ে পড়ল। সামন্ততন্ত্রের যুগকে আমরা সব দিক দিয়ে অবক্ষয়ের যুগ বলে মনে করতে পারি।

ইউরোপ ও ভারতে সামন্ততন্ত্রের কাল ঃ সাধারণত পঞ্চম থেকে পঞ্চদশ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত পশ্চিম ইউরোপ ও ভারতে সামন্ততন্ত্রের যুগ অব্যাহত ছিল। এই দুই অঞ্চলের পরিস্থিতিতে কিছু সাদৃশ্য ছিল। ইউরোপে রোমের পতন এবং ভারতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন অন্ধকার যুগের সূচনা করেছিল। অবশ্য ভারতের সমাজ, অর্থনীতি ও ধর্মের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যের পরিমাণ ছিল বেশী। পশ্চিম ইউরোপে ৮০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে কিছুটা রাজনৈতিক শৃঙ্খলা এসেছিল, যদিও সামন্ততন্ত্র এই শৃঙ্খলাকে অনেকটা বিপর্যস্ত করেছিল। উত্তর ভারতে হর্ষবর্ধনের পরবর্তী কালে সামন্ততন্ত্র অনেক বেশী শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। অবশ্য এই যুগেও শিল্প ও সংস্কৃতির অগ্রগতি হয়েছিল। দ্বাদশ খ্রীস্টাব্দ থেকে পশ্চিম ইউরোপে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল, যার পরিণতি আমরা পঞ্চদশ শতাব্দীর নবজাগরণের মধ্যে পাই। ভারতেও পঞ্চদশ শতাব্দীতে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল।

ইতিহাস ও মধ্যযুগের বৈচিত্র্য ঃ এ কথা অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, ইতিহাসকে কোন নির্দিষ্ট ছকে ফেলা যায় না। এক যুগ থেকে

আর এক যুগের পরিবর্তন ধীরে ধীরে সাধিত হয়। তবে যখন একটি যুগের বিশেষত্বগুলি মোটামুটিভাবে পরিস্ফুট হয় তখনই আমরা তাকে নতুন যুগের শুরু বলে মনে করি। মানুষের ইতিহাস কিন্তু যন্ত্রের মত চলে না। পৃথিবীর সব দেশে একই সময়ে বা একই ভাবে এই মধ্যযুগ আসে নি। প্রাচীন এশিয়ার দেশগুলিতে, বিশেষত ভারতবর্ষে, প্রাচীন যুগের কৃষিজাত ইউরোপের মত দাসদের উপর নির্ভরশীল ছিল না। সে সব দেশে ক্রীতদাস প্রথা ছিল ঠিকই, তবে স্বাধীন চাষী বা শ্রমিকেরও অস্তিত্ব ছিল। পশ্চিম ইউরোপে রোমান সাম্রাজ্যের পতন মধ্যযুগের সূচনা করলেও পূর্ব ইউরোপে বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যে আপাতত কোনও পরিবর্তন হয় নি। পশ্চিম ইউরোপের কৃষিকেন্দ্রিক অর্থনীতিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিমাণ কমে গিয়েছিল, কিন্তু বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যের সঙ্গে এশিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্য অব্যাহত ছিল। 'অন্ধকার' যুগে পশ্চিম ইউরোপ গ্রীস ও রোমের সংস্কৃতি বিস্মৃত হয়েছিল, কিন্তু পূর্ব ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়ার বিস্তৃত অঞ্চলে এই সংস্কৃতির প্রভাব ছিল উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পশ্চিম ইউরোপে মধ্যযুগের সূচনা ঃ বর্বর জাতিদের আগমন, আক্রমণ এবং বসতি স্থাপন

রোম সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ঃ ইটালীতে রোমান সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান পৃথিবীর ইতিহাসে এক যুগান্তকারী অধ্যায়। ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলসমূহ এবং এশিয়া ও আফ্রিকার কিছু অংশ অধিকার করে রোমান সম্রাটরা এক বিশাল সাম্রাজ্য সৃষ্টি করেছিলেন। কিন্তু কালের নিয়মে একদিন এই প্রবল প্রতাপান্বিত সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের পথে যেতে হয়েছিল। পরবর্তী রাজারা অত্যাচারী, বিলাসী ও দুর্বল ছিলেন। তাঁদের বিলাসিতার খরচ মেটাতে জনসাধারণকেও প্রচুর অর্থ দিতে হত। ক্রমে অর্থ নৈতিক জীবনেও ভাঙ্গন ধরল। চতুর্দিকে বিদ্রোহ দেখা দিল। রোমের বাইরের শত্রুরা এই সুযোগে রোম আক্রমণ করল।

জার্মান উপজাতিসমূহ ও তাদের রোমান সাম্রাজ্যে অনুপ্রবেশ ঃ যে বিদেশী জাতিরা রোম আক্রমণ করেছিল তাদের

'বার্বারিয়ান (Barbarian) বলে অভিহিত করা হয়। বার্বারিয়ানরা রোমানদের মত উচ্চমানের সংস্কৃতির অধিকারী ছিল না। এদের অধিকাংশই শ্লাভ ও জার্মান উপজাতিভুক্ত ছিল। এদের আদি বাসস্থান ছিল উত্তর স্কাণ্ডিনেভিয়া। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং অনুর্বর জমি এদের খাদ্যসমস্যা সৃষ্টি করেছিল। সুতরাং নতুন উপনিবেশ স্থাপনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উপজাতি বেরিয়ে পড়ল। রুমানিয়াতে এল ভিসিগথ বা পশ্চিমী গথরা, উত্তর হাঙ্গেরীতে এল ভ্যাণ্ডালরা, রাইন উপত্যকায় পূর্ব-গথরা ও ভোলগা এলাকায় অ্যালেনরা। এরা রোম সাম্রাজ্যের ভিতরে ঢুকে বসতি স্থাপন করল। রোমের অনেক জায়গা মহামারী বা যুদ্ধবিগ্রহের ফলে জনশূন্য হয়ে পড়েছিল। উপজাতিরা সে সব জায়গায় প্রায় বিনা বাধায় ঢুকে যেত। কখনো বা রোমান সম্রাটের অনুমতিও এরা পেত—যেমন পেয়েছিল পন্নোনিয়ার ভ্যাণ্ডালরা। এসব উপজাতির মধ্যে যারা শক্তিশালী ছিল, তারা আবার দুর্বল জাতিদের রাজ্য দখল করে নিত। রোমের সৈন্যদলেও অনেক জার্মান যোগ দিয়েছিল। রোমানদের সঙ্গে উপজাতিদের ছোটখাট সংঘর্ষ হত। অবশ্য সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াস-এর সময় পর্যন্ত পারস্পরিক সম্পর্ক মোটামুটি শান্তিপূর্ণ ছিল। কিন্তু খুব বেশীদিন এই শান্তিপূর্ণ অবস্থা চলতে পারল না।

হূণদের আগমন ও বিভিন্ন বর্বর জাতির রোম আক্রমণ : রোমের উপর বর্বরদের আক্রমণের প্রধান কারণ ইউরোপে হূন জাতির আবির্ভাব। পীতবর্ণ মঙ্গোলীয় জাতিশাখার অন্তর্গত হূণদের আদি বাসভূমি ছিল মধ্য এশিয়ায়। হূণরা ছিল যেমন দুর্ধর্ষ ও রণকুশলী তেমনি হিংস্র ও নিষ্ঠুর। তাদের নামেই আতঙ্কের সৃষ্টি হত। তারা ছিল যাযাবর, ঘোড়ার পিঠেই তাদের অধিকাংশ সময় কাটত, আগুনের ব্যবহার তারা করত না। ফলমূল ও কাঁচা মাংস ছিল তাদের খাদ্য। চামড়া ছিল প্রধান পরিধেয়। বর্শা, তীর ও তলোয়ার ছিল তাদের যুদ্ধাস্ত্র। খ্রীস্টীয় প্রথম শতকে খাদ্যের অভাবে ও প্রাকৃতিক পরিবর্তনের ফলে তারা পশ্চিমে অভিযান চালায় ও রাশিয়ায় বসতি স্থাপন করে। চতুর্থ শতক থেকে রোম ও পশ্চিম ইউরোপের উপর তাদের আক্রমণ শুরু হয়। অস্ট্রোগথদের পরাজিত করে তারা ভিসিগথদের আক্রমণ করল। ভীত ভিসিগথরা রোমান সম্রাট

থিওডোসিয়াসের অনুমতি নিয়ে রোমের একাংশে বসবাস করতে লাগল। কিন্তু কিছুদিন পর ভিসিগথরা আড্রিয়ানোপলের যুদ্ধে আশ্রয়দাতা সম্রাটকে হারিয়ে বুলগেরিয়া দখল করল।

অ্যালারিকের আক্রমণ ঃ সম্রাট থিওডোসিয়াসের মৃত্যুর পর ৩৯৫ খ্রীস্টাব্দে রোম সাম্রাজ্য দুভাগে ভাগ হয়ে গেল—পূর্ব দিকে বাইজান্টাইন এবং পশ্চিমে রোমান সাম্রাজ্য। রোম সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ভিসিগথদের রাজা অ্যালারিক ৪১০ খ্রীস্টাব্দে রোমে প্রবেশ করে তিনদিনব্যাপী লুণ্ঠন চালিয়েছিলেন। কেবলমাত্র রোমের গীর্জা ছাড়া আর কিছুই তার হাত থেকে রক্ষা পেল না। এর কিছুদিন পরেই অ্যালারিকের মৃত্যু হয়।

অ্যাটিলা ঃ হৃতশক্তি পুনরুদ্ধার করবার আগেই রোমকে দুর্ধর্ষ হূণজাতির আক্রমণের সম্মুখীন হতে হল। পঞ্চম শতাব্দীতে হূণদের মধ্যে অ্যাটিলা নামে এক শক্তিশালী নেতার অভ্যুত্থান হয়েছিল। এশিয়ার উরাল অঞ্চল থেকে রাইন নদীর তীর পর্যন্ত বিস্তৃত রাজ্যের অধিকারী এই হূণ নেতার প্রধান শিবির ছিল হাঙ্গেরীতে। তখনও তারা তাঁবুতে বাস করত। নিষ্ঠুরতার জন্য অ্যাটিলা 'ঈশ্বরের অভিশাপ' নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি বল্কান উপদ্বীপের সত্তরটিরও বেশী শহর ধ্বংস করেছিলেন। ৪৫১ খ্রীস্টাব্দে গল আক্রমণ করে তিনি উত্তর গলের প্রতিটি শহর লুণ্ঠন করেছিলেন। তবে ফ্রাঙ্ক, ভিসিগথ ও রোমানদের সম্মিলিত সৈন্যরা তাঁকে ট্রয়েসের যুদ্ধে পরাজিত করেছিল। পরের বৎসর তিনি অ্যাকুলিয়া, পাদুয়া ও মিলান লুণ্ঠন করেন। তবে নিয়মিত অমোঘ বিধানে রোম তাঁর হাত থেকে রক্ষা পেল। নিজের বিবাহের ভোজসভার পরেই তাঁর মৃত্যু হয়। অ্যাটিলার মৃত্যুতে হূণ সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ল।

গেনসেরিকের রোম আক্রমণ ঃ পঞ্চম খ্রীস্টাব্দে ভ্যাণ্ডালরা স্পেন, উত্তর আফ্রিকা ও কার্থেজ অধিকার করে। তারা শক্তিশালী নৌবাহিনীর সাহায্যে সমুদ্রের উপর আধিপত্য গড়ে তুলেছিল। গেনসেরিকের নেতৃত্বে ৪৫৫ খ্রীস্টাব্দে ভ্যাণ্ডালরা রোমে প্রবেশ করল এবং লুঠতরাজ করে রোমনগরীকে ধ্বংস করল।

পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঃ ৪৭৬ খ্রীস্টাব্দে শেষ রোমান সম্রাট রোমুলাস অগাস্টালাস সেনাপতি ওডোবেকার-কর্তৃক

সিংহাসন থেকে বিতাড়িত হলে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন হল। পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য তখনও অটুট ছিল এবং প্রাচীন ঐতিহ্য অনুযায়ী পশ্চিম ইউরোপের দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের উপর পড়েছিল। অবশ্য বাস্তবে পশ্চিম ইউরোপ বর্বর উপজাতিদের হাতে চলে গিয়েছিল।

জার্মান উপজাতিদের সমাজ, অর্থনীতি, প্রশাসন ও ধর্ম: রোমের নেতা জুলিয়াস সিজার ও ঐতিহাসিক টাসিটাসের লেখা থেকে জার্মান উপজাতিদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়। দীর্ঘ, বলিষ্ঠ এবং নীল চোখ ও তামাটে চুল বিশিষ্ট জার্মানরা আর্যজাতিরই শাখা। তারা গ্রামে উন্মুক্ত জায়গায় বাস করত এবং ঘনবসতি অপছন্দ করত। গ্রামের প্রতিটি বাড়ির চারপাশে অনেক খালি জায়গা রাখা হত। কাঠ দিয়ে তৈরী বাড়ির উপর মাটির প্রলেপ দেওয়া হত ও খড়ের ছাউনি থাকত। জল সরবরাহের ব্যবস্থার দিকে যত্ন রাখা হত। তবে গ্রামগুলি এত বিচ্ছিন্নভাবে থাকত যে, তাদের মধ্যে ভাবের বিশেষ কোনও আদান-প্রদান ছিল না। টাসিটাস এদের সরল জীবন-যাত্রার প্রশংসা করেছেন। গ্রামগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। এক রকম মোটা সুতোর তৈরী কাপড় এরা পরত। অতি প্রচণ্ড শীতে উত্তরের জার্মানরা পশুর চামড়ার আচ্ছাদন পরিধান করত।

জার্মানদের প্রধান উপজীবিকা ছিল চাষবাস, শিকার ও গবাদি পশুপালন। চাষের ব্যবস্থা অনুন্নত ছিল। বলদে টানা লাঙল দিয়ে চাষ করা হত। গম ও যব ছিল প্রধান খাদ্যশস্য। কোনরকম শিল্প-উৎপাদন বা ব্যবসা-বাণিজ্য তখনও গড়ে উঠে নি। অবশ্য টাকা-পয়সার ব্যবহার অজানা ছিল না এবং বেচাকেনার জন্য বিনিময় প্রথাও চালু ছিল। বন্য ফল, শিকার করা জন্তুর মাংস ও দৈ ছিল এদের দৈনন্দিন আহার্য। তবে উপজাতিরা অতিথিবৎসলতার জন্য বিখ্যাত ছিল। তারা চাষবাস করাকে রোমানদের মত নীচু চোখে দেখত না। বর্শা, তলোয়ার, তীর-ধনুক, ঢাল ও শিরস্ত্রাণ ছিল প্রধান যুদ্ধাস্ত্র। কোন বড় যোদ্ধার অনুচর হয়ে থাকার প্রথা জার্মান যুবকদের মধ্যে খুবই প্রচলিত ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে নেতাকে ফেলে পালিয়ে আসা অসম্মানজনক মনে করা হত। জার্মান মেয়েরাও খুব সাহসী ছিল। পুরুষদের সাহস ও উৎসাহ দেবার জন্য তারা যুদ্ধক্ষেত্রের কাছেই উপস্থিত থাকত। জুয়া

খেলা, রথ চালনা, অসি চালনা প্রভৃতি ছিল এদের অবসর যাপনের পন্থা। জুয়ায় সর্বস্ব হারাতে এদের দ্বিধা ছিল না। সত্য পালনের জন্য ক্রীতদাস হতেও এরা আপত্তি করত না।

জার্মানদের মধ্যে তিনটি সামাজিক শ্রেণী ছিল, যথা—অভিজাত, স্বাধীন জনসাধারণ ও দাস। এই দাসদের আবার ভূমিদাস ও ক্রীতদাস এই দুইভাগে ভাগ করা হত। ভূমিদাসদের নিজের জমি ছেড়ে অন্যত্র যেতে হত না। কিন্তু ক্রীতদাসরা প্রভুর সম্পত্তি বলে গণ্য হত। তাহলেও এদের অবস্থা রোমান ক্রীতদাসদের চেয়ে ভাল ছিল। বহুবিবাহের প্রচলন ছিল না। সমাজে মেয়েদের যথেষ্ট সম্মান দেওয়া হত। গৃহস্থালীর কাজকর্ম মেয়েরাই চালাত। সরল, অনাড়ম্বর অথচ আদিম জীবনযাত্রা এদের বলিষ্ঠ ও পরিশ্রমী করে তুলেছিল।

রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে অভিজাত ও স্বাধীন জনসাধারণের মধ্যে কোন বৈষম্য ছিল না। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসন পরিচালিত হত। জার্মানরা অত্যন্ত স্বাধীনতাপ্রিয় ছিল। দলপতির প্রতি বিশ্বস্ততা ছিল তাদের বৈশিষ্ট্য। দলপতিরা স্বাধীন জনসাধারণ নিয়ে গঠিত সভার পরামর্শ মত শাসন চালাত। কয়েকটি পরিবার মিলে একটি 'গ্রাম' বা মার্ক গড়ে উঠত। গ্রামের স্বাধীন জনসাধারণের সভাকে বলা হত মুট। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে গঠিত হত কাউন্টি ও কয়েকটি কাউন্টির সমাবেশে গঠিত হত রাজ্য।

জার্মানরা প্রাকৃতিক শক্তিকে দেবতা বলে কল্পনা করে তাঁর আরাধনা করত। যুদ্ধের দেবতা ওডিন, পৃথিবীর দেবতা হার্থা, বজ্রের দেবতা থর এবং সৃষ্টির দেবী ফ্রিয়া বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী ছিলেন। সমগ্র গোষ্ঠীর একজন পুরোহিত থাকতেন। তবে পুরোহিত শ্রেণীর অস্তিত্ব ছিল না। পরিবারের প্রধানই (পিতা) পুরোহিতের কাজ করতেন। জার্মান দেবতাদের নাম থেকেই ইংরেজী সপ্তাহের দিনগুলোর নামকরণ হয়েছে।

পশ্চিম ইউরোপে উপজাতিদের বসতি স্থাপন এবং রোমের সংস্কৃতির প্রভাব : এই কর্মঠ ও যুদ্ধনিপুণ জাতিরা ক্ষয়িষ্ণু রোম সাম্রাজ্যের পতনকে ত্বরান্বিত করল। রোম সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন জার্মান উপজাতি স্থায়ী হয়ে বসল। ভিসিগথরা দখল করল

স্পেন ও দক্ষিণ গল। অ্যাঙ্গল ও স্যাক্সনরা ব্রিটেন অধিকার করল। জার্মানীতে ফ্র্যাঙ্করা, ফ্রান্সের পূর্বভাগে বার্গাণ্ডিয়ানরা, স্পেনে

ভিসিগথরা, পর্তুগালে সুয়েভিরা, রোমে লম্বার্ড ও আফ্রিকায় ভ্যাণ্ডালরা রাজ্য স্থাপন করল।

বহুদিন থেকে রোমের সভ্যতা ও জীবনধারার সংস্পর্শে থাকার ফলে জার্মানরা রোমের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। তা ছাড়া, রোমের অধিবাসীদের সঙ্গে এদের বিবাহ-সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। পরবর্তী কালে রোমের প্রভাবে জার্মানরা খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত হয়। সর্বপ্রথমে উইফিলাসের প্রভাবে গথরা খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। পরে অন্য গোষ্ঠীগুলি তাদের উদাহরণ অনুসরণ করেছিল। খ্রীস্টধর্মের ক্ষমা ও প্রেমের আদর্শ বর্বরদের যুদ্ধপিপাসাকে হয়তো কিছুটা সংযত করেছিল। খ্রীস্টীয় গীর্জা, মঠ ও গ্রন্থাবলী এদের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার অনুপ্রেরণা জাগিয়েছিল।

সুতরাং প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস হলেও, রোমান সভ্যতা ও সংস্কৃতি, ধ্বংসকারী বর্বরদের মধ্যে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। ধীরে ধীরে গথ, ভিসিগথ, ভ্যাণ্ডাল প্রভৃতি বর্বর জাতি পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে উঠল। রোমের প্রশাসন, আইন ও সমাজ-ব্যবস্থার অনেক কিছু তারা গ্রহণ করল। রোমান সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ঐক্য মধ্যযুগের ইউরোপকে অনুপ্রাণিত করেছিল। কালক্রমে রোমান ও বর্বরদের সংস্কৃতির সংমিশ্রণে ব্যাপকতর ইউরোপীয় সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

তৃতীয় অধ্যায়

পশ্চিম ইউরোপে ‘অন্ধকারাচ্ছন্ন’ যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতি

খ্রীস্টীয় ৪র্থ-৭ম শতাব্দীতে পশ্চিম ইউরোপের সভ্যতা : খ্রীস্টান গীর্জা ও মঠসমূহের অবদান

অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ : ঐতিহাসিকেরা খ্রীস্টীয় চতুর্থ থেকে সপ্তম শতাব্দীকে পশ্চিম ইউরোপের ইতিহাসে ‘অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ’ বলে অভিহিত করেছেন। তাঁদের মতে বর্বরদের অত্যাচারে মধ্যযুগে সভ্যতা

ও কৃষ্টির সমস্ত চিহ্ন লোপ পেয়ে গিয়েছিল। এই সময় রোমের সাম্রাজ্য ধ্বংসোন্মুখ ছিল। রোম, পাদুয়া, মিলান প্রভৃতি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বর্বরদের আক্রমণে বিধ্বস্ত হওয়ায় সভ্যতার অনেক নিদর্শন লুপ্ত হয়ে যায়। রাজনৈতিক অরাজকতা, সাংস্কৃতিক অবক্ষয় এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয় রোমান যুগের সুফলকে অনেকাংশে নষ্ট করে ফেলেছিল।

তা হলেও এ যুগকে সম্পূর্ণভাবে বিধ্বংসী বললে ভুল করা হবে। খ্রীস্টীয় ধর্মযাজকরা সভ্যতার আলো জ্বেলে রেখেছিলেন। তাঁদের গঠিত গীর্জা ও মঠই ছিল একাধারে সভ্যতার সংরক্ষক, ধারক ও
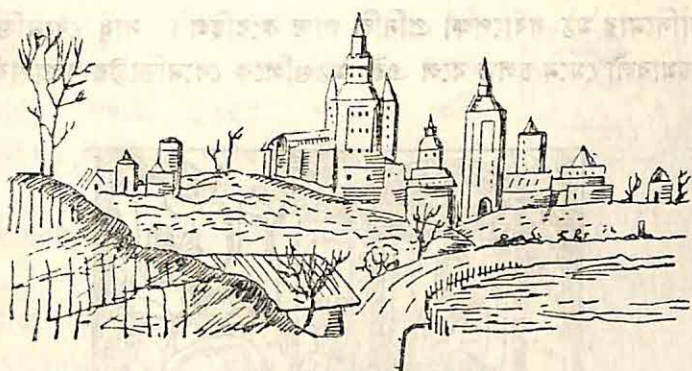
মঠ

প্রতিপালক। বর্বর জাতিদের আক্রমণের ফলে যখন ইউরোপ বিধ্বস্ত তখন শিক্ষার প্রসার বন্ধ হয়ে গেল। ফলে জনসাধারণের অধিকাংশ হল নিরক্ষর। এই সময়ে একমাত্র ধর্মযাজকদের মধ্যে কিছু লেখাপড়ার চর্চা ছিল। ধর্মপুস্তক পড়ার জন্য তাঁদের জ্ঞানচর্চা করতে হত। ল্যাটিন জানারও দরকার ছিল। সুতরাং জার্মান বর্বর রাজারা রাজকার্য পরিচালনার জন্য গীর্জার যাজকদের সাহায্য নিতেন। সামাজিক, প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ধর্মযাজকদের বিশেষ ভূমিকা ছিল। রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর চার্চ ছিল পশ্চিম ইউরোপীয় ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু। এখানে প্রতিভাশালী লেখকদের সমাবেশ হত। মধ্যযুগের জনসাধারণের শিক্ষার ভার নিলেন এই আলোকপ্রাপ্ত যাজক-সম্প্রদায়।

খ্রীস্টীয় সংগঠন ও ধর্মযাজকদের ভূমিকা

সাধু বেনেডিক্ট ও তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন মঠ : যাজক সম্প্রদায়ের মধ্যে একদল ধর্মসাধনায় রত থাকতেন। অনেকে মঠ তৈরী করে তাতে বাস করতেন। মঠের অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার মাধ্যমে সন্ন্যাসীরা খ্রীস্টধর্মের পবিত্রতার আদর্শ অনুসরণ করতেন। প্রতিটি মঠ নিজের নিজের নিয়মাবলী মেনে চলত। এই সময়ে সাধু বেনেডিক্ট নামে এক খ্রীস্টান সন্ত সুনীতি ও ধর্মাচরণের জন্য খ্যাতিলাভ করেন। তৎকালীন সামাজিক অনাচারে বিরক্ত হয়ে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁর অনুগামীদের সংখ্যা এত বেড়ে গেল যে, তিনি তেরটি মঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার মধ্যে ইটালীর মন্টি-ক্যাসিনোর মঠ সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। সাধু বেনেডিক্টের নিয়মাবলী মেনে চলত বলে এই মঠগুলিকে বেনেডিক্টের সম্প্রদায়ভুক্ত

মণ্টিক্যাসিনোর মঠে সাধু বেনেডিক্ট

বলে গণ্য করা হত। বেনেডিক্ট মিশর প্রভৃতি পূর্বদেশের খ্রীস্টান সন্ন্যাসীদের মত কৃচ্ছ্রসাধন করে দেহকে কষ্ট দেবার পক্ষপাতী ছিলেন না। তবে তিনি কঠোর অনুশাসন এবং আত্মসংযম সম্পর্কে নির্দেশ দিতেন। মঠের সদস্যদের লেখাপড়া শেখা আবশ্যকীয় ছিল, যাতে বাইবেল ও অন্যান্য ধর্মপুস্তক পড়তে তাঁদের অসুবিধা না হয়। সাধু বেনেডিক্ট মঠের আবাসিকদের জন্য যে কর্মসূচী তৈরী করেছিলেন তার মধ্যে তিন থেকে পাঁচ ঘণ্টা সময় পড়াশোনার জন্য নির্ধারিত ছিল। তবে তাঁদের অধ্যয়ন ও

অধ্যাপনা ছিল মূলত ধর্মকেন্দ্রিক। মঠগুলিকে বিদ্যাচর্চার প্রকৃত কেন্দ্রে পরিণত করলেন বেনেডিক্টের ভাই ক্যাসিওডোরাস। তিনি একটি মঠ স্থাপন করেছিলেন এবং সেখানে খ্রীস্টীয় ধর্মপুস্তক ছাড়াও গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যের বহু মূলবান পুস্তক সংগ্রহ করেছিলেন। এই মঠে হাতে লেখা পাণ্ডুলিপির একটি বড় গ্রন্থাগার গড়ে উঠল। পুথি নকল করতেও তিনি উৎসাহ দিতেন। পুথি নকল করা অতি কষ্টসাধ্য ছিল। তবে এখানে সুরক্ষিত থাকার জন্য অনেক মূল্যবান বই ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। ক্যাসিওডোরাস সন্ন্যাসীদের মধ্যে সমাজ-সচেতনতা আনতে চেষ্টা করেন। তাঁর মতে, যেহেতু ধর্ম-প্রতিষ্ঠানগুলিকে ও সন্ন্যাসীদের সমাজ পোষণ করছে, সুতরাং সমাজের প্রতি তাঁদের কর্তব্য আছে। তাঁর উৎসাহে বালকদের শিক্ষাদান, আর্তের সেবা ইত্যাদি জনসেবামূলক কাজে যাজকরা ও সন্ন্যাসীরা অগ্রণী হয়ে উঠেছিলেন। শিক্ষা ও সমাজসেবার প্রকল্প থেকে চিকিৎসাবিদ্যার চর্চা প্রসারলাভ করল। দুর্বল ও আর্ত একমাত্র চার্চেই আশ্রয় পেত। চার্চের আশ্রিতদের ক্ষতি করার কোন ক্ষমতা কারো ছিল না। অত্যাচারী রাজাকে সংযত রাখার ক্ষমতাও কেবল চার্চেরই ছিল।

সন্ন্যাসী

চার্চের তৈরী বহু আইন দ্বারা ইউরোপের সমস্ত খ্রীস্টানদের ধর্মীয় জীবন ও কিছু পরিমাণে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনও নিয়ন্ত্রিত হত। ধর্মযাজকরা ভাল ও মন্দ, পাপ ও পুণ্যের একটা সুনির্দিষ্ট ধারণা লোকের সামনে তুলে ধরেছিলেন। বিভিন্ন সুনীতির ধারণা বর্বর ও অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে সভ্যতার সঞ্চার করল ও তাদের মধ্যে নৈতিক আদর্শ তুলে ধরল। দুর্ধর্ষ ভিসিগথ নেতা অ্যালারিক পোপের কথায় রোম লুণ্ঠন থেকে নিবৃত্ত হয়েছিলেন। বর্বরদের মধ্যে খ্রীস্টধর্ম প্রচারিত হলে তার ফল শুভ হয়েছিল।

পাপ ও পুণ্যের ধারণা

সুতরাং 'অন্ধকারাচ্ছন্ন' যুগ সম্পর্কে গতানুগতিক ধারণা যুক্তি অথবা তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। রোমান সাম্রাজ্যের পতন যথেষ্ট ক্ষতির কারণ হলেও পশ্চিম ইউরোপ থেকে সভ্যতা ও সংস্কৃতি লুপ্ত হয় নি। রোমের প্রশাসন, আইন ও জীবনযাত্রার অনেক কিছুই বর্বররা গ্রহণ করেছিল। বর্বরদেরও নিজস্ব সংস্কৃতি ছিল। এই দুই সভ্যতার সমন্বয় ইউরোপকে অনেক কিছু দিয়েছিল। খ্রীস্টধর্মের মধ্য দিয়ে সভ্যতার ধারা প্রবাহিত হয়েছিল। এই যুগে পরিবেশ অনুকূল না থাকলে প্রাচীন গ্রীস ও রোমের সংস্কৃতি পরবর্তীকালের ইউরোপ উত্তরাধিকার-সূত্রে পেত না।

চতুর্থ অধ্যায়
বাইজান্টাইন সভ্যতা

খ্রীস্টধর্মের অভ্যুদয় ইউরোপের ইতিহাসে এক নব জীবনের সূচনা করেছিল। অবশ্য অনেকদিন পর্যন্ত রোমের সম্রাটরা খ্রীস্টধর্মকে স্বীকৃতি দেন নি। নীরো, ডায়োক্লিশিয়ান প্রমুখ সম্রাট খ্রীস্টানদের উপর অত্যাচার করেছেন। ২৭২ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট কনস্টানটাইন সিংহাসনে আরোহণের পরে এই দমননীতির অবসান হয়। সম্রাট ঘোষণা করলেন যে, খ্রীস্টানদের উপর আর অত্যাচার করা হবে না। অবশেষে কনস্টানটাইন নিজেও খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করলেন। খ্রীস্টধর্ম রোমের রাজশক্তির স্বীকৃতি পেল। পরবর্তী যুগে খ্রীস্টধর্ম ইউরোপের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে আচ্ছন্ন করেছিল।

সম্রাট কনস্টানটাইন ও খ্রীস্টধর্ম

খ্রীস্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ দশকে রোমের ইতিহাসে আর একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হচ্ছিল। রোম সাম্রাজ্য পূর্ব ও পশ্চিম এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। এই ভাগের সূত্রপাত হয়েছিল যখন তৃতীয় শতকে সম্রাট ডায়োক্লিশিয়ান রাজধানী এশিয়া মাইনরের নিকোমিডিয়াতে স্থানান্তরিত করেন। সম্রাট কনস্টানটাইন কৃষ্ণসাগরের তীরবর্তী গ্রীক শহর বাইজান্টিয়ামে রাজধানী স্থাপন করলেন। সম্রাটের নাম

অনুসারে বাইজাণ্টাইনের নতুন নাম হল কনস্টান্টিনোপল। ৩৯৫ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট থিয়োডোসিয়াস তাঁর দুই পুত্র হনোরিয়াস ও আর্কেডিয়াসকে যথাক্রমে, পূর্বসাম্রাজ্য ও পশ্চিম সাম্রাজ্যের সিংহাসন দিলেন। রোম সাম্রাজ্য দু-ভাগে ভাগ হয়ে গেল। রোম হল পশ্চিম সাম্রাজ্যের রাজধানী ও কনস্টান্টিনোপল হল পূর্ব সাম্রাজ্যের রাজধানী।

পূর্ব ও পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা
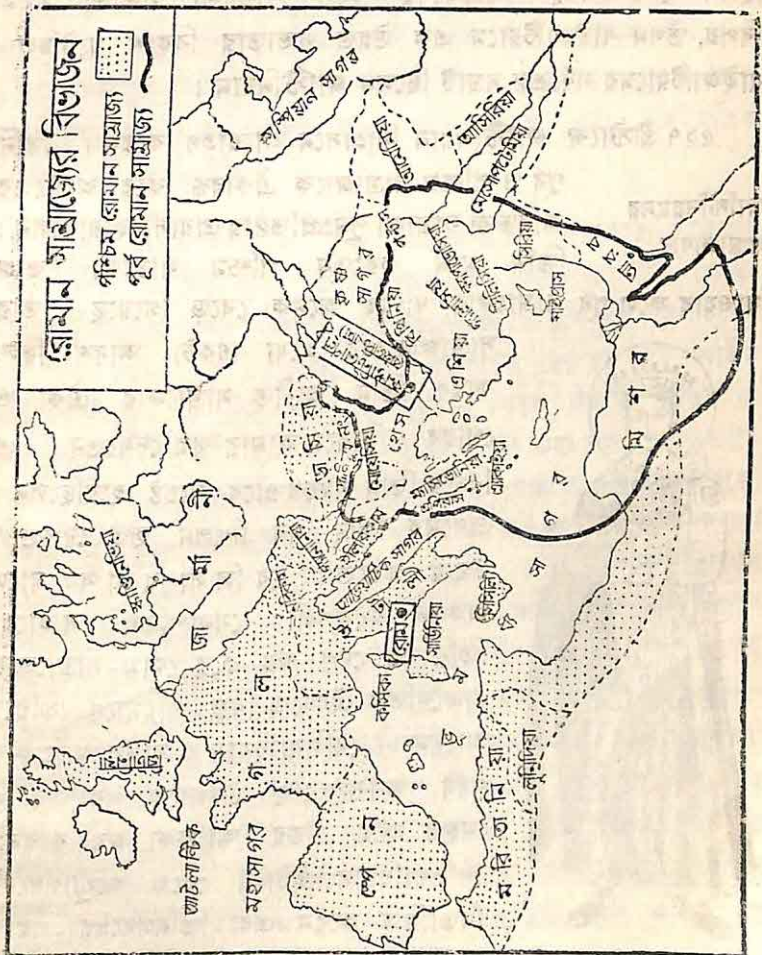
এই দুই সাম্রাজ্যেই খ্রীস্টধর্মকে রাজশক্তির স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। দুই সাম্রাজ্যের ইতিহাসে খ্রীস্টধর্ম স্থায়ী আসন লাভ করল। ধীরে ধীরে

দুই সাম্রাজ্যের ইতিহাস আলাদা পথে প্রবাহিত হতে লাগল। অবশ্য রোম ও কনস্টান্টিনোপলের মধ্যে নানা রকমের যোগাযোগ ছিল।

পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর আরও এক হাজার বৎসর পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য নিজের অস্তিত্বকে বজায় রাখতে পেরেছিল। তখন রোমান সাম্রাজ্য বলতে পূর্ব বা বাইজান্টিয়াম-এর সাম্রাজ্যকেই বোঝাত। এই সাম্রাজ্য রাজনৈতিক দিক দিয়ে শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ ছিল। সেই বর্বর আক্রমণের ফলে পাশ্চাত্য সভ্যতা যখন বিপন্ন, তখন বাইজান্টিয়ামে এক উন্নত সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। বাইজান্টিয়ামের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন জাস্টিনিয়ান।

জাস্টিনিয়ানের সাম্রাজ্যবাদ

৫২৭ খ্রীস্টাব্দে জাস্টিনিয়ান সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পূর্ব ও পশ্চিম সাম্রাজ্যকে ঐক্যবদ্ধ করে অতীতের অবিভক্ত সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়াসী হয়েছিলেন। তিনি মনে করতেন পশ্চিম সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যাওয়ার ফলে পূর্ব সাম্রাজ্যের দায়িত্ব অনেক বেড়ে গিয়েছে। তাঁর সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে একটা আদর্শ ছিল, কারণ তিনি অতীত সাম্রাজ্যের ঐক্য ও গৌরব ফিরিয়ে আনার স্বপ্ন দেখতেন। এ বিষয়ে তিনি সক্রিয়ভাবে সচেষ্ট হয়েছিলেন। প্রথমেই তিনি মন দিলেন হৃত দেশগুলি উদ্ধার করতে। বে লি সা রি য়া স নামে একজন রণকুশলী সেনাপতির সাহায্যে তিনি বহু দেশ জয় করে রোম সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ঐক্যকে কিছু পরিমাণে ফিরিয়ে আনেন। বেলিসারিয়াস ও নর্থেস আফ্রিকার দুর্ধর্ষ ভ্যাণ্ডালরাজ টটিলাকে পরাজিত ও নিহত করে উত্তর আফ্রিকা জয় করেন। বেলিসারিয়াস ইটালী থেকে অস্ট্রোগথদের বিতাড়িত করেন এবং ভিসিগথদের পরাস্ত করে স্পেনের দক্ষিণাংশে রোমের আধিপত্য বিস্তার করেন। এইভাবে ভূমধ্যসাগরে আবার রোমের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু পশ্চিমে বেশী নজর দেবার ফলে পারসিকরা

জাস্টিনিয়ান

বারবার পূর্বসীমান্তে হানা দিতে লাগল। যদিও বেলিসারিয়াস পারসিকদের সঙ্গে যুদ্ধে তাদের একবার পরাজিত করেছিলেন, পরে পারসিকরা সে পরাজয়ের শোধ নিয়েছিল। জাস্টিনিয়ার অর্থ দিয়ে পারসিকদের নিবৃত্ত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। বেলিসারিয়াসের সাফল্যে ঈর্ষান্বিত সম্রাট তাঁর উপর এত কুপিত হয়েছিলেন যে, এই বীর যোদ্ধার শেষজীবন দুঃখে ও দারিদ্র্যে কেটেছে। অবশ্য জাস্টিনিয়ানের ঐক্যবদ্ধ রোমান সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সফল হয় নি। তাঁর আদর্শ যুগোপযোগী ছিল না। পশ্চিম ইউরোপ থেকে বর্বরদের বিতাড়িত করা অসম্ভব ছিল। ক্রমাগত যুদ্ধের ফলে জাস্টিনিয়ানের সৈন্যবাহিনী ক্লান্ত হয়ে পড়ল এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সূত্রপাত হল।

জাস্টিনিয়ান সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা বলতে কেবলমাত্র রাজ্যজয় বোঝান নি। তিনি মনে করেছিলেন যে, সাম্রাজ্যের পূর্ব গৌরব ফিরিয়ে আনতে গেলে পুরানো আইন-কানুন ফিরিয়ে আনতে হবে।

জাস্টিনিয়ানের আইন, স্থাপত্য ও চিত্রকলা

সম্রাটের নির্দেশে ও উৎসাহে রোমের সব আইন সংগ্রহ করে ও সুসংবদ্ধ করে **কর্পাস জুরিস** বা রোমক আইন সংহিতা প্রস্তুত করা হল। এমনভাবে এগুলি সাজানো হল যাতে এগুলির বক্তব্য সকলে, এমন কি, ছাত্ররাও সহজে বুঝতে পারে ও কাজে লাগাতে পারে। এই 'কর্পাস জুরিস'-এর তিনটি অংশ ছিলঃ (১) কোড—রোমের ভূতপূর্ব সম্রাটের প্রণীত যেসব আইন তখনও কার্যকরী ছিল সেগুলি এই অংশে স্থান পেল। (২) ডাইজেস্ট—এখানেও রোমের আইনজ্ঞদের রচিত আইনগুলি লিপিবদ্ধ করা হল। (৩) ইনস্টিটিউট—এই অংশে রোমান আইনের ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। 'কর্পাস জুরিস' জাস্টিনিয়ানের মহত্তম কীর্তি। যদিও জাস্টিনিয়ান নতুন আইন প্রণয়ন করেন নি, শত শত বৎসরের আইন সুসংবদ্ধ করে তিনি সমাজের অশেষ মঙ্গলসাধন করেছিলেন। এর ফলে সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সকলের মনে আশা জেগেছিল। জাস্টিনিয়ানের আইন বহু শত বৎসর ধরে ইউরোপকে পথ দেখিয়েছিল।

তদানীন্তন স্থাপত্য ও চিত্রকলা জাস্টিনিয়ানের বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় দেয়। তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরী বাঁধানো রাস্তা, স্নানাগার ও

বাঁধ উৎকর্ষের প্রমাণ দেয়। এই সময়ে গ্রীক ও প্রাচ্য স্থাপত্য রীতির সংমিশ্রণে এক নতুন রীতির প্রবর্তন হয়েছিল। জাঁকজমক ও আড়ম্বর ছিল এর বৈশিষ্ট্য। জাস্টিনিয়ান রাজধানী ও বড় শহরগুলিকে বহু সুন্দর গীর্জা ও প্রাসাদে সজ্জিত করেছিলেন। নানা রঙের মোজাইকের কাজে ও আলোকমালায় সজ্জিত এই সব গীর্জা ঝলমল করত। কেবল রাজধানীতেই তিনি চব্বিশটি গীর্জা তৈরী করেছিলেন। এর মধ্যে সেন্ট সোফিয়ার গীর্জা শিল্পসৌন্দর্যে অনবদ্য ছিল। নানা রঙের মার্বেল পাথরে তৈরী এই গীর্জা দশ হাজার শ্রমিকের পরিশ্রমে সাড়ে পাঁচ
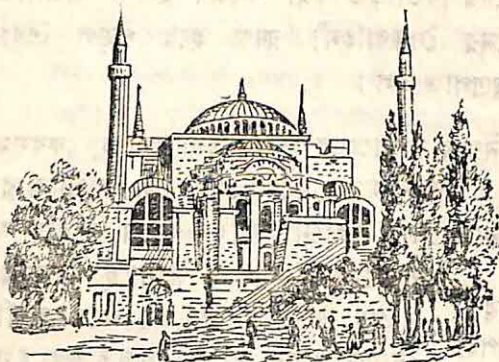
সেণ্ট সোফিয়ার গীর্জা : কনস্টাণ্টিনোপল

বৎসরে নির্মিত হয়েছিল। সোনা, রূপা, হাতির দাঁত ও মূল্যবান পাথরে খচিত কারুকার্য এর সৌন্দর্যকে বাড়িয়ে তুলেছে। ভিতরের তারের কাজ ও মোজাইক বা ছোট রঙীন কাচ ও পাথরের ছবি ছিল অপূর্ব। এই গীর্জাকে বাইজাণ্টাইন শিল্পরীতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলা হয়। এ ছাড়া, শ্বেত মার্বেলের তৈরী সেনেট সভাগৃহ বা রাজপ্রাসাদ, চ্যালসিডনে নির্মিত গ্রীষ্মাবাস প্রভৃতি উন্নত স্থাপত্যকলার পরিচয় দেয়।

বাইজাণ্টাইনের অঙ্কন-রীতি ধর্মকে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। শিল্পীরা প্রধানত গীর্জার দেওয়ালে মোজাইকের সাহায্যে যীশুখ্রীস্ট, মেরী বা খ্রীস্টান সাধুদের জীবনকে ফুটিয়ে তুলতেন। এ ছাড়া, কাপড়ে সূচীশিল্পের সাহায্যে ধর্মীয় ছবি অঙ্কন করে গীর্জার দেওয়ালে সাজানো হত। উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। উজ্জ্বল ও জাঁকজমকপূর্ণ ছবি দিয়ে রাজপ্রাসাদকে সজ্জিত করা হত।

বর্বরদের আক্রমণের ফলে পশ্চিম রোমান সভ্যতা যখন ধ্বংসের পথে যাচ্ছিল তখন বাইজাণ্টাইনের সাম্রাজ্য ছিল ইউরোপীয় সভ্যতার কেন্দ্র। বাইজাণ্টাইন সম্রাটরা শিল্প ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং কনস্টান্টিনোপলকে রোমের বিকল্প হিসাবে গড়ে তুলেছিলেন। ভৌগোলিক দিক দিয়ে সুরক্ষিত হওয়ায় কনস্টান্টিনোপলের জীবনযাত্রা বৈদেশিক আক্রমণে বিপর্যস্ত হত না। ভূমধ্যসাগরের উপর আধিপত্য বাণিজ্যে শ্রীবৃদ্ধির কারণ হয়েছিল। শাসকরা নানা দেশ

বাইজাণ্টাইন সভ্যতার অবদান

গ্রীক-আগুন (Greek-Fire)

থেকে বিলাসের জিনিস আনতেন। কৃষ্ণসাগরের উপকূল থেকে আসত খাদ্যশস্য ও পশুচর্ম, আবিসিনিয়া থেকে আসত হাতির দাঁত, নিগ্রো দাস ও সোনা, চীন পাঠাত রেশম এবং ভারতবর্ষ থেকে আসত বহুমূল্য রত্নরাজি। এ সবের পরিবর্তে বাইজান্টিয়াম পাঠাত শিল্পপণ্য ও সোনা। জলযুদ্ধের জন্য 'গ্রীক-আগুন'* ব্যবহৃত হত। স্থলপথে এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্ক অব্যাহত ছিল। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি শিল্প ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছিল।

বাইজান্টাইন সভ্যতা বহু জাতির অবদানে গড়ে উঠেছিল। গ্রীক ও রোমক সংস্কৃতির সঙ্গে প্রাচ্যের ভাবধারার সংমিশ্রণ ঘটেছিল। খ্রীস্টধর্ম এই বহুবিস্তৃত সভ্যতাকে আরও মহিমান্বিত করে তুলেছিল।

---

* নৌযুদ্ধে পরস্পরের বিরুদ্ধে আগুনের গোলা নিক্ষিপ্ত হত। প্রাচীন গ্রীকরা এই যুদ্ধকৌশল চালু করেছিল।

এই খ্রীস্টধর্মও গ্রীক-সংস্কৃতির দ্বারা এত প্রভাবিত হয়েছিল যে, এখানে গ্রীক সনাতনপন্থী গীর্জার প্রতি অনুগত সম্প্রদায়ের প্রাধান্য ছিল বেশী।

গ্রীক ও প্রাচ্যরীতির সমন্বয়ে নতুন স্থাপত্য-রীতির প্রচলন হয়। সেন্ট সোফিয়ার গীর্জা, র‍্যাভেনার গীর্জাগুলি, নীয়ার প্রার্থনাগৃহ, এ্যাথসের লাভরা নামক মঠ, যোসিসের সেন্ট লুক সংঘারাম প্রভৃতি শিল্পশৈলীর পরিচয় বহন করে। অ্যান্টিয়োকের প্রাসাদগুলি মুসলমানদেরও প্রশংসা অর্জন করেছিল। এইসব গীর্জা ও প্রাসাদের আভ্যন্তরীণ সজ্জার জন্য নানারকম শিল্পশৈলী গড়ে উঠেছিল, তার মধ্যে সবচেয়ে উন্নত ছিল নানারঙের কাচের ও পাথরের টুকরোর মোজাইক-কাজ এবং সোনা-রূপার তারের জালি কাজ। এ ছাড়া, হাতির দাঁত, কাঠ, লোহা প্রভৃতির সাহায্যে গৃহসজ্জার জিনিস তৈরী হত, এনামেল-করা পাত্র তৈরীর কাজে সমকালীন শিল্পীরা দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। বয়নশিল্প খুব উন্নত ছিল। তৎকালীন শিল্পীর তৈরী সোনালী রঙের নক্সাকাটা নীল পাত্র খুব সমাদৃত হত। পুঁথি চিত্রিত করার শিল্পও অগ্রগতি লাভ করেছিল। তবে, মূর্তিনির্মাণ শিল্প খুব উন্নতি করতে সক্ষম হয় নি, কারণ, মূর্তিপূজা গ্রীক চার্চ সম্প্রদায় পছন্দ করতেন না। চিত্রশিল্পীরা সমাজ-জীবনের নানারকম ছবি আঁকতেন। রাজা ও রাজপুরুষরা যান্ত্রিক খেলনা পছন্দ করতেন। কলের পাখি গান করত, কলের সিংহ গর্জন করত। চমকপ্রদভাবে রাজপ্রাসাদ সাজানো হত। থিওডিফিলাসের সভায় একটি সোনার গাছ ছিল—তাতে সোনার পাখি শোভা পেত।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও বাইজান্টাইন সভ্যতা পিছিয়ে ছিল না। ইতিহাস, অভিধান, বিশ্বপরিচয় ইত্যাদি রচিত হয়েছিল। লিওর ইতিহাস, কনস্টান্টাইনের 'গ্রীক অ্যান্থলজি', পলের 'চিকিৎসা-সার' ইত্যাদি বই জ্ঞানের প্রসারের পরিচয় বহন করে। স্যালোনিকাবাসী বিখ্যাত গণিতজ্ঞ লিওর নাম বাগদাদ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। মাইকেল সেলাস সে যুগের বিখ্যাত দার্শনিক ছিলেন। কনস্টান্টিনোপলের বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। যখন ইউরোপে পারসিক ও মুসলমানরা হানা দিচ্ছিল তখন বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য গ্রীক ও রোমক সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। গ্রীক দর্শন ও সাহিত্য সম্বন্ধীয় বই এখানে হাতে লেখা হত।

মধ্যযুগীয় সভ্যতায় বাইজাণ্টাইন যুগের দান অসামান্য। তৎকালীন পশ্চিম ইউরোপীয় সভ্যতার চেয়ে বাইজাণ্টাইন সভ্যতার মান বেশী উন্নত ছিল। একদিকে গ্রীকো-রোমান সভ্যতার উত্তরাধিকার এবং আর একদিকে প্রাচ্য-সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্ক এই সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করেছিল। রাজনৈতিক স্থিতি ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এই সভ্যতাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল। ১৪৫৩ খ্রীস্টাব্দে তুর্কী মুসলমানদের আক্রমণে বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যের পতন হল এবং ইউরোপে আধুনিক যুগের সূচনা হল।

পঞ্চম অধ্যায়
ইসলাম ধর্ম ও তার প্রভাব

আরব অঞ্চল : ভুগোল ও জন-সাধারণ

এশিয়ার দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত আরব দেশ আয়তনে ইউরোপের চার ভাগের এক ভাগ। এই অঞ্চল লোহিত সাগর ও পারস্য সাগর দ্বারা বেষ্টিত। এখানকার অধিকাংশ জায়গাই মরুময়। আরবভূমি পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শুষ্ক অঞ্চল। বৎসরের অধিকাংশ সময়ে এখানে প্রচণ্ড তাপমাত্রা থাকে। যদিও মিশর, আসিরীয়, পারসিক, গ্রীক, রোমান প্রমুখ উন্নত সভ্যতা এই দেশের নিকটবর্তী অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল, তথাপি পুরাকালে আরব দেশে সভ্যতার বিশেষ উন্মেষ হয় নি। রাজনৈতিক ঐক্য না থাকায় আরবরা যেমন প্রতিবেশী রাজ্যগুলি জয় করবার চেষ্টা করে নি, বিদেশীরাও তেমনি এই দেশের দুর্ধর্ষ আরব অধিবাসীদের জয় করবার চেষ্টা করে নি। বিশেষত, বিদেশীদের প্রলুব্ধ করবার মত সম্পদ এ দেশে তখন ছিল না। মক্কা ও মদিনা ছিল দুটি প্রধান আরব শহর।

ইসলাম ধর্ম প্রচারের আগে আরবদের মধ্যে কোন শৃঙ্খলা বা একতা ছিল না। মরুভূমির কঠোর জীবনযাত্রার ফলে এরা যেমন স্বাধীনতাপ্রিয় ও কষ্টসহিষ্ণু ছিল তেমনই ছিল দুর্ধর্ষ ও প্রতিহিংসা-পরায়ণ। সাধারণত দুই শ্রেণীতে এদের ভাগ করা যেত—সারবানী ও মরুবানী। সারবানী তাদের বলা হত যারা বাড়িঘর তৈরী করে চাষ-আবাদের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করত। মরুবাসী বা বেদুইন

আরবরা যাযাবর ছিল। শিকার বা পশুপালন ছাড়া লুঠতরাজ করে তারা জীবিকা-নির্বাহ করত। খেজুর, উটের মাংস এবং দুধ এদের প্রধান খাদ্য ছিল।

কোন রকম রাজনৈতিক ঐক্য না থাকায় দেশে বিশৃঙ্খলার অবধি ছিল না। বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত আরবরা নিজের নিজের গোষ্ঠী-প্রধান বা শেখের আনুগত্য মেনে চলত। তা ছাড়া, বিভিন্ন গোষ্ঠীকে নিয়ে এক একটি সভা ছিল। শেখরা এই সভার উপদেশ মেনে চলত। কিন্তু কঠোর জীবনযাত্রার ফলে জলের কুয়ো, মরূদ্যান, উট ইত্যাদির অধিকার নিয়ে সর্বদা ঝগড়া ও মারামারি বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে লেগে থাকত। আরবরা একদিকে যেমন অতিথিবৎসল, অন্য-দিকে তেমনি প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিল। এক গোষ্ঠীর লোক অন্য গোষ্ঠীর কাউকে মেরে ফেললে সেই গোষ্ঠী প্রতিশোধ নিত। তারা আইন-কানুন নিজেদের হাতে নিত বলে লুঠতরাজ, খুন এদের নিত্য-সঙ্গী ছিল।

মক্কা শহর আরবদের প্রধান ধর্মীয় কেন্দ্র ছিল। এখানে কাবা
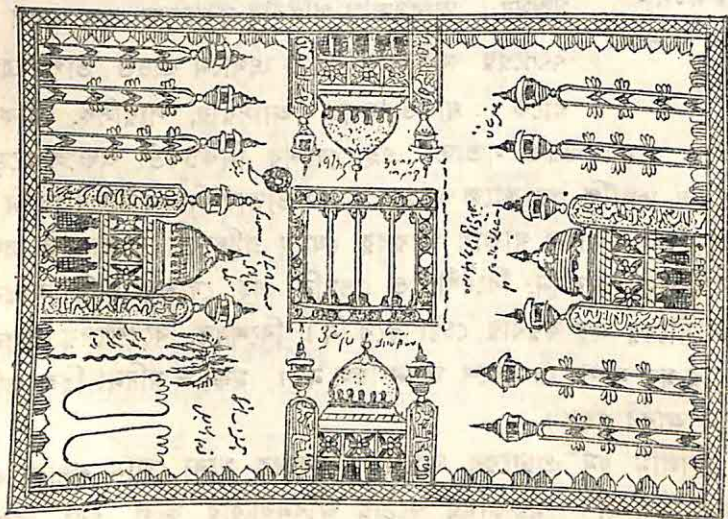
কাবা মন্দির ঃ মক্কা

মন্দিরে একটি কালো পাথরকে সব উপজাতি প্রধান দেবতা বলে গণ্য করত। এ ছাড়া, কাবাতে সাড়ে তিন'শ দেব-দেবীর মূর্তি ছিল। কিন্তু হানিফ বলে একটি সম্প্রদায় একেশ্বরবাদে বিশ্বাস করত।

আরবরা বহু প্রাচীনকাল থেকে ব্যবসা-বাণিজ্যে মন দিয়েছিল। মক্কা শহর ছিল একটি বাণিজ্যকেন্দ্র। গান ও কবিতা আরবদের অতি প্রিয় ছিল। মাঝে মাঝে এক একটি শহরে মেলা বসত ও দূর-দূরান্ত থেকে আরবরা এসে কবিতা প্রতিযোগিতায় যোগ দিত।

হজরত মহম্মদ ও তাঁর বাণী

৫৭০ খ্রীস্টাব্দে মক্কা শহরে হজরত মহম্মদ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পবিত্র কোরেশি গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন। এই গোষ্ঠী কাবার মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ করত। মহম্মদের মা ছিলেন আমিনা এবং পিতা ছিলেন আবদুল্লা। বালক বয়সে পিতৃমাতৃহীন মহম্মদ পিতামহ আবদুল মোতালিব ও পরে কাকা আবু তালিবের কাছে প্রতিপালিত হন। বাল্যকাল থেকেই তিনি পরদুঃখ-কাতর ও মিষ্টভাষী ছিলেন। পরিবারের সকলের মত তাঁকেও ছোটবেলায় পশুচারণ করতে হত। পরে খাদিজা নামে এক ধনী বিধবা তাঁকে তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্য দেখবার জন্য নিযুক্ত করেন। এই কাজ তিনি যোগ্যতার সঙ্গেই সম্পন্ন করেছিলেন। কিছুদিন পর খাদিজাকে তিনি বিবাহ করেন। চল্লিশ বৎসর বয়সে ইহুদী ও খ্রীস্টানদের সঙ্গে তিনি ধর্মালোচনা শুরু করেছিলেন। তাঁর মনে গভীর ধর্মভাবের উদয় হয়। মক্কার বাইরে হীরা পর্বতের গুহায় তিনি ঈশ্বর-চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। এই সময়ে তিনি দৈববাণীতে ঈশ্বরের আদেশ শুনতে পান। কথিত আছে, ঈশ্বরের দূত জিব্রিল তাঁকে দেখা দিয়ে বলেন যে, ঈশ্বর এক এবং তিনিই 'রসুল' বা আল্লার দূত। সর্বপ্রথমে তাঁর স্ত্রী খাদিজা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। তিনি সর্বশক্তিমান এবং বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা। তাঁর আদেশ পালন না করলে মৃত্যুর পরে শেষ বিচারের দিনে শাস্তি পেতে হবে। তাঁর আদেশ পালন করলে মৃত্যুর পরে স্বর্গলাভ হবে। মহম্মদ ঈশ্বরের দূত ও বাণীবাহক। ইসলাম ধর্ম যে-কেউ গ্রহণ করতে পারে। মুসলমানদের ধর্ম-গ্রন্থ কোরাণে মহম্মদ ঈশ্বরের কাছে যে প্রত্যাদেশ পেয়েছিলেন তা ও হাদিসে মহম্মদের উপদেশাবলী লিপিবদ্ধ হয়েছিল। প্রত্যেক মুসলমানের পাঁচটি আবশ্যকীয় কর্তব্য আছেঃ (১) এক ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং ঈশ্বরের বাণীবাহক মহম্মদে বিশ্বাস; (২) প্রত্যহ পাঁচবার করে মক্কার

দিকে মুখ করে পবিত্রভাবে প্রার্থনা ; (৩) দান ; (৪) রমজান মাসে উপবাস ও (৫) মক্কায় অন্তত একবার তীর্থযাত্রা করা। এ ছাড়া, ইসলাম ধর্ম বলে যে, ঈশ্বরের চোখে সব মানুষ সমান ও সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ থাকা দরকার।

এরপর মহম্মদ নতুন ধর্ম প্রচারে মন দিলেন। মদিনা ও কাছাকাছি অঞ্চল থেকে যারা মক্কায় বিভিন্ন কাজে আসত, তারা মহম্মদের প্রচারে আকৃষ্ট হয়েছিল। কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি মক্কাবাসীদের, বিশেষত, কোরেশি সম্প্রদায়ের বিরাগভাজন হলেন। তারা তাঁর প্রাণনাশের চেষ্টা করল। কিন্তু প্রতিবেশী মদিনাবাসীরা মহম্মদকে সাদর আহ্বান জানাল। সংগোপনে ৬২২ খ্রীস্টাব্দে তিনি তাঁর বিশ্বস্ত শিষ্যদের নিয়ে মদিনায় যান। এই যাত্রাকে হিজরা বলা হয়। হিজরা-কাল থেকে মুসলমানদের বৎসর গণনা করা হয়। মক্কাবাসীরা মদিনা আক্রমণ করলেও মদিনা দখল করতে পারে নি। মহম্মদ মদিনায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে বুঝতে পারলেন যে, যুদ্ধ ব্যতীত আরবদের মধ্যে ধর্মপ্রচার সম্ভব হবে না। বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে তিনি মক্কা আক্রমণ করে জয়ী হলেন। পরাজিত মক্কাবাসীদের এমন কি, তাঁর শত্রুদেরও তিনি ক্ষমা করেন। মাত্র ৬২ বৎসর বয়সে তিনি দেহত্যাগ করেন।

ইসলাম ধর্ম গ্রহণের ফলে আরবরা এক নতুন ধর্মের ভিত্তিতে সংঘবদ্ধ হল। তাদের নৈতিক ও চারিত্রিক উন্নতি হল। পরস্পর বিবদমান উপজাতির সমষ্টি থেকে আরবরা এক সংঘবদ্ধ জাতিতে পরিণত হল। সপ্তম শতাব্দীতে আরবরা নতুন উৎসাহ ও উন্মাদনায় সাম্রাজ্য গঠনে মনোনিবেশ করল।

ইসলাম ধর্ম আরবের মরুপ্রান্তরে জন্মলাভ করে অল্প দিনের মধ্যে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। মহম্মদ-প্রবর্তিত ধর্ম অত্যন্ত সহজ ও সরল। তাই আরবেরা সহজে এর প্রতি আকৃষ্ট হয়। মহম্মদের পূর্ববর্তী যুগে আরবদের ধর্ম ও সমাজে অনেক গলদ ছিল বলে ইসলাম তাদের

কাছে মুক্তির বার্তা নিয়ে এসেছিল। ধর্মপ্রচারের জন্য মৃত্যু বরণ করলে শহীদের মর্যাদা পাওয়া যাবে এবং স্বর্গবাস হবে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে মুসলমানরা জীবনপণ করে যুদ্ধ করত। রাজনৈতিক কারণও এর পিছনে ছিল। পারসিক এবং বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্য তখন ধ্বংসের পথে যাচ্ছিল। পারস্যে কু-শাসন এবং পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের খ্রীস্টানদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে হানাহানি মুসলমানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। এই দুটি দুর্বল সাম্রাজ্য আক্রমণ করা মুসলমানদের পক্ষে শক্ত ছিল না। সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়ার জনসাধারণ সহজেই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হল। খ্রীস্টধর্মের অহিংসার বাণী ও সন্ন্যাসজীবন অমুসলমানদের যুদ্ধ করবার ক্ষমতাকে দুর্বল করে ফেলে। আরবরা তাদের ধর্মযুদ্ধের প্রেরণা ও উন্নত যুদ্ধকৌশল নিয়ে সহজেই বিজেতার ভূমিকা গ্রহণ করতে পারল। মুসলমানদের রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল। ইসলামের প্রাথমিক অধ্যায়ে কয়েকজন অসাধারণ খলিফা ইসলামকে অগ্রগতির পথে নিয়ে গিয়েছিলেন। ইসলামের সামাজিক সাম্য পুরাতন ক্ষয়িষ্ণু সমাজে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছিল। ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ইসলামকে গৌরবান্বিত করেছিল। সামরিক ক্ষেত্রে মুসলমানরা অপেক্ষাকৃত আধুনিক অস্ত্র ও তীব্র গতিসম্পন্ন অশ্বারোহী বাহিনীর সাহায্যে যুদ্ধে জয়লাভ করত। সব মিলিয়ে সে যুগে ইসলাম এক উন্নততর রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছিল এবং ধর্মের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল।

ইসলাম ধর্মের দ্রুত বিস্তারের কারণ

মহম্মদ কেবল ধর্মগুরু ছিলেন না। তিনি একাধারে সেনাপতি, আইনপ্রণেতা, বিচারক ও শাসক ছিলেন। এরপর থেকে ইসলামের প্রভাবে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল। মহম্মদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে পরবর্তী কালের মুসলমানরা শক্তিশালী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। পরবর্তী কালে মুসলমানদের ধর্মীয় নেতা ও রাজনৈতিক নেতা একই

বিভিন্ন খলিফা ও আরব সাম্রাজ্য

ব্যক্তি হতেন—তাঁকে বলা হত 'খলিফা'। মহম্মদের মৃত্যুর পর তাঁর শ্বশুর ও অন্যতম প্রধান শিষ্য আবুবকর ধর্মীয় নেতা হলেন। তারপর যথাক্রমে ওমর, ওসমান ও আলি তাঁর প্রথম সারির অনুগামী খলিফা হলেন। তাঁরা 'ধার্মিক খলিফা' নামে বিখ্যাত।

মুসলমানরা মনে করত যে, অমুসলমান দেশে ইসলাম ধর্ম প্রচার করলে স্বর্গলাভ হবে। তা ছাড়া, সমৃদ্ধ প্রতিবেশীদের ধনসম্পদ লুণ্ঠন করা আর নিজেদের যুদ্ধ-পিপাসা চরিতার্থ করার আকাঙ্ক্ষা আরব বেদুইনদের মধ্যে ছিল। তাই ধার্মিক খলিফাদের রাজত্বকালেই ইরাক, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, পারস্য ও মিশর বিজিত হয়েছিল। তবে বিস্তীর্ণ রাজ্যের অধীশ্বর হওয়া সত্ত্বেও ধার্মিক খলিফারা অত্যন্ত অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন। কথিত আছে, ওমর তাঁর সেনাপতিদের দামী পোশাক দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে ঢিল ছুঁড়ে মারেন। কিন্তু আরবদের বিলাসিতা বন্ধের চেষ্টা করেও তিনি খুব বেশি সফল হন নি।

খলিফাদের যুদ্ধ

আলির মৃত্যুর পর সিরিয়ার শাসক মুবাইয়া আলির পুত্র হুসেনকে সরিয়ে খলিফার পদ অধিকার করেন। হুসেনের সঙ্গে মুবাইয়ার শর্ত ছিল যে, হুসেনের ভাই হাসান তাঁর পরে খলিফা হবেন। কিন্তু চুক্তি অগ্রাহ্য করে তিনি তার পুত্র এজিদকে খলিফার পদে বসিয়েছিলেন। দুর্নীতিপরায়ণ এজিদ হুসেন ও তাঁর পরিবারবর্গকে কৌশলে কারবালার প্রান্তরে এনে হত্যা করলেন। হুসেনের শিশু-পুত্ররা, স্ত্রী, পরিবারবর্গ কেউ রক্ষা পেল না। কারবালার এই দুঃখজনক স্মৃতির স্মরণে আজও মুসলমানরা মহরমের শোকদিবস পালন করেন।

মুসলমানরা এসময় শিয়া ও সুন্নী এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে গেল। কিন্তু সিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমানরা ধার্মিক তিনজন খলিফাকে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছিল। যাই হোক, এর পর থেকে খলিফার পদ বংশগত হল। মুবাইয়ার প্রতিষ্ঠিত ওমায়াদ বংশ দু'শ বৎসর রাজত্ব করার পর মহম্মদের পিতৃব্য আব্বাসের বংশধররা আব্বাসীয় বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। আব্বাসীয়রা ভারতবর্ষের সিন্ধুপ্রদেশ, বেলুচিস্তান,

তুর্কীস্তান, মেসোপটেমিয়া, আমোনিয়া, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, সাইপ্রাস, ক্রীট, মিশর ও উত্তর আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। ইউফ্রেটিস নদীর তীরে বাগদাদে তাঁদের
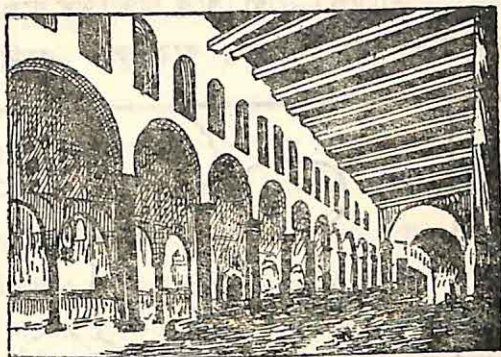
ওমায়াদ মসজিদ ঃ দামাস্কাস

নতুন রাজধানী হল। তাঁদের মধ্যে খলিফা হারুন-অল-রসিদের নাম প্রসিদ্ধ। তাঁর মত সুশাসক ও প্রজাবৎসল রাজা ইতিহাসে বিরল। রোজ রাত্রে তিনি ছদ্মবেশে দেশের সর্বত্র ঘুরে প্রজাদের অবস্থা নিরীক্ষণ করতেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে অভাবনীয় উন্নতির ফলে দেশ সমৃদ্ধ হল। আরবরা বিলাস-ব্যসনে অভ্যস্ত হল। কঠোর জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত আরবরা বাইজান্টাইন ও পারসিক সাম্রাজ্যের আড়ম্বরের পরিচয় পেয়ে অভিভূত হয়েছিল। বাগদাদ তার ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। বাগদাদের বিরাট বাজার দেশী ও বিদেশী জিনিসের সম্ভারে পরিপূর্ণ ছিল। গুণগ্রাহী হারুন-অল-রসিদের সভায় কবি, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, শিল্পী ও সাহিত্যিকরা সমবেত হলেন। সাংস্কৃতিক কেন্দ্ররূপে বাগদাদ প্রসিদ্ধি লাভ করল। হারুন-অল-রসিদের রাজত্বকালে সংকলিত আরব্য রজনীর গল্প আজও সারা বিশ্বে সমাদৃত। বিখ্যাত জার্মান সম্রাট শার্লেমান তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। চীন, মিশর ও ভারতের সঙ্গেও বাগদাদের বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল।

এই সময় ইউরোপে মুসলমান প্রাধান্য বিস্তৃত হয়েছিল। ৭০০ খ্রীস্টাব্দে জিব্রাল্টার অতিক্রম করে মুসলমান সেনাপতি তারিক

ভিসিগথদের পরাজিত করেন। পীরেনিজ পর্বত অতিক্রম করে মুসলমানরা স্পেন অধিকার করলেন। তাঁদের গতিরোধ করলেন ফ্রান্সের বীর নৃপতি চার্লস মার্টেল। ফ্রান্স থেকে বিতাড়িত হলেও মুসলমানরা স্পেনে প্রায় সাতশ বৎসর রাজত্ব করেছিল। কর্ডোভায় স্পেনের

ইসলামের স্পেন বিজয়

খলিফাদের রাজধানী ছিল। স্পেনের আরবরা মূর নামে আখ্যাত।

মূর-শাসনকালে স্পেনে শিল্প, বিজ্ঞান, গণিত, দর্শন, আইন ও চিকিৎসাবিদ্যার অভূতপূর্ব উন্নতি হয়। ওমায়াদ খলিফাদের আমলে কর্ডোভা একটি উন্নত সভ্যতার কেন্দ্র বলে পরিগণিত হয়। ইসলাম ধর্ম, চিকিৎসাবিদ্যা, শল্যবিদ্যা ও সঙ্গীত-চর্চার জন্য কর্ডোভা বিখ্যাত ছিল। এখানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের বহু বিদ্যার্থীর সমাগম হত। স্থাপত্যশিল্প বিশেষ অগ্রগতি লাভ করেছিল। এ ছাড়া, চর্মশিল্প, রেশম শিল্প ও অলঙ্কার-নির্মাণ শিল্পের উৎকর্ষের জন্য কর্ডোভা প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। মূরদের আমলে দেশে খ্রীস্টান, ইহুদী ও মুসলমানরা শান্তিতে বাস করত। প্রাসাদ, মসজিদ এবং ফোয়ারা-শোভিত উদ্যান আলোয় ঝলমল করত। তা ছাড়া, স্নানাগার ও পাথরে তৈরি রাজপথ পূর্তবিদ্যার ও স্থাপত্যশিল্পের অগ্রগতির পরিচয়। কর্ডোভা, টলেডো, গ্রানাডা, সেভিল প্রভৃতি শহরে বহু বিদ্যালয়, উচ্চ-শিক্ষার কেন্দ্র ও বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠল। বই বাঁধানোর শিল্প ও চিত্রিত পুঁথি রচনার পদ্ধতি আজও আমাদের বিস্ময়ের কারণ। অসংখ্য গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মসজিদগুলি ধর্মীয় শাস্ত্রচর্চার কেন্দ্র ছিল এবং স্ত্রী-শিক্ষা প্রসার লাভ করেছিল। আলি-ইবন-হাজির, মাস-লামা-ইবন-আহ মেদ, ইব্রাহিম-আল-জা-র-কুলি প্রভৃতি পণ্ডিত শাসকদের আনুকূল্য পেতেন। আবুল কাসিমের আলতমরিক নামক অস্ত্রোপচার সম্বন্ধীয় গ্রন্থ চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নতির প্রমাণ।
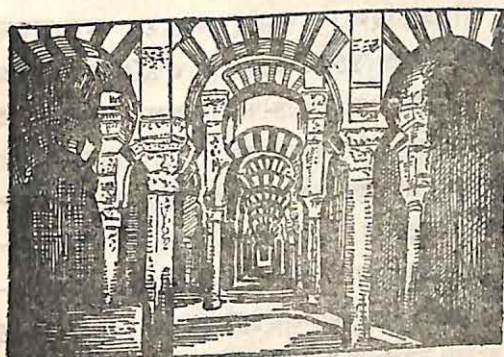
ওমায়াদ মসজিদ ঃ কর্ডোভা

আরব-সভ্যতার অবদান

আরবরা উদার মনোভাব নিয়ে পৃথিবীর সব সভ্য দেশের সংস্পর্শে এসেছিল বলে এক উন্নত সভ্যতার সৃষ্টি হয়েছিল। সারা পৃথিবী আরব সভ্যতার কাছে ঋণী। স্থাপত্যের ক্ষেত্রে আরবরা মিশরীয় ও বাইজাণ্টাইন রীতিতে প্রভাবিত হয়েছিল। নানা দেশের শিল্পরীতির সংমিশ্রণে

অ্যারাবেস্ক-রীতির প্রচলন হয়েছিল। কর্ডোভার নীল মসজিদ এবং আল হামরার মসজিদ এই রীতি অনুসরণে নির্মিত হয়েছিল। আরব শিল্পীরা ফল, ফুল, লতা-পাতা ও নানা জ্যামিতিক গঠনের সমন্বয়ে সুন্দর নক্শা আঁকায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। পাথর বা কাঠ খোদাই করে নানা রকমের জালের কাজ এবং সোনা ও রূপার তারের কাজেও এদের দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। মসজিদ ও প্রাসাদ নানারকম মোজাইক বা পাথরকুচি, রঙ্গীন কাচ ইত্যাদি দিয়ে সজ্জিত হত। আলোকসজ্জার অপূর্ব ব্যবস্থা ছিল।

চীনাদের কাছ থেকে আরবরা কাগজ তৈরি এবং ভারতের কাছ থেকে গণিতবিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্র শিখেছিল। এ ছাড়া, সিরিয়া ও মিশরের মাধ্যমে গ্রীক-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে আরবরা গ্রীক ও রোমান সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। গণিত, চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও পদার্থশাস্ত্রে গবেষণামূলক কাজ হয়েছিল। আরবী সংখ্যা কঠিন রোমান সংখ্যার পরিবর্তে ব্যবহৃত হতে লাগল। রসায়নবিদ্‌রা নানা রকমের নির্যাস তৈরি করে প্রতিভার পরিচয় দেন। খ্রীস্টীয় জগতের দর্শনের সঙ্গে আরবদের পরিচয় ছিল। আরব জগতের কয়েকজন বিখ্যাত পণ্ডিতের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। এঁদের অন্যতম ছিলেন অল মামুন। ৮ ০ খ্রীস্টাব্দে বায়ত-অল-হিলমা বা 'জ্ঞানের আগার' নামে এক প্রতিষ্ঠান তিনি গঠন করেন। এই প্রতিষ্ঠানের পুস্তকাগারে নানা শাস্ত্র-চর্চার ব্যবস্থা ছিল। এখানে একটি অনুবাদ বিভাগ ছিল—সেখানে প্রাচীন গ্রীক পুঁথির অনুবাদ হত। হুনায়ুন-ইবন-ইসাক একজন বিখ্যাত অনুবাদক। ইবন-সিন্না ছিলেন চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ও দার্শনিক। অল-ফারাবি আলেপ্পো নিবাসী বিখ্যাত দার্শনিক। অলরাজি ছিলেন বিখ্যাত চিকিৎসা-বিজ্ঞানী। অল হাই-থামের প্রসিদ্ধি ছিল চক্ষুবিজ্ঞান শাস্ত্রে। আলবেরুণী বা ইবন মহম্মদ ছিলেন একাধারে গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, পদার্থবিদ্ এবং কবি। তাঁর তহকিক-ই-হিন্দ গ্রন্থ ভারতে হিন্দুদের আচার-ব্যবহার ও ধর্ম সম্বন্ধে লেখা। ইবন বতুতা ছিলেন প্রসিদ্ধ ভূপর্যটক। মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে তিনি ভারতে আসেন। আরব ঐতিহাসিক ইবন-খলদুন ইতিহাসের উপর ভৌগোলিক অবস্থানের প্রভাব সম্বন্ধে বই লিখেছেন। তাঁর গ্রন্থে আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায়।

আরব সংস্কৃতি পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে যোগসূত্র রচনা করেছিল। প্রাচীন যুগের বিভিন্ন সভ্যতার গুণাবলী আহরণ করে আরব সভ্যতার অসাধারণ অগ্রগতি হয়েছিল। ইসলাম এই সভ্যতার অনুপ্রেরণা হলেও প্রাক্-ইসলাম যুগের অনেক কিছুই আমরা এই সভ্যতায় পেয়েছি, তৎকালীন বিশ্ব-ইতিহাসে আরবদের ভূমিকা প্রতিভার দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে উঠেছিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপ

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজাদের মধ্যে মহামতি চার্লস বা শার্লেমান অন্যতম। শার্লেমান ফ্র্যাঙ্ক জাতির অন্তর্ভুক্ত ক্যারোলিঞ্জিয়ান বংশীয় ছিলেন। খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতকে ইউরোপের যেসব উপজাতি রাজ্য স্থাপন করেছিল তাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রবল ছিল ফ্র্যাঙ্করা।

শার্লেমান

৭৬৪ খ্রীস্টাব্দে শার্লেমান অস্ট্রেসিয়া বা বর্তমান জার্মানীর সিংহাসন লাভ করলেন। তাঁর ভাই লাভ করলেন নিউস্ট্রিয়া অর্থাৎ ফ্রান্সের সিংহাসন। কিছুদিন পর সেই ভাই-এর মৃত্যুতে ফ্রান্সের সিংহাসনও তাঁর করায়ত্ত হয়েছিল। শার্লেমানের জীবন সম্বন্ধে তথ্যাবলী তাঁর প্রিয় পার্ষদ আইন-হার্ডের বই থেকে জানা যায়।

শার্লেমান

শার্লেমান মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ দিগ্বিজয়ী রাজা ছিলেন। দীর্ঘ ৪৬ বৎসর রাজত্বকালের মধ্যে তিনি চুয়ান্নটি যুদ্ধ করেছিলেন। লম্বার্ডি, ব্যাভেরিয়া, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, স্যাক্সনী ও স্পেনের বার্সিলোনা জয় করে তিনি এক সুবিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হন। স্লাভ, ডেন, স্যাক্সন, আভার, ডালশশিয়ান প্রমুখ দুর্ধর্ষ উপজাতিদের পরাজিত করে খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করান। স্যাক্সনদের সঙ্গে যুদ্ধ করে যখন তিনি ফিরে আসছিলেন

রাজ্য বিস্তার

তখন গ্যাস্কন নামে এক পার্বত্য জাতি তাঁকে ও তাঁর সৈন্যদের ঘিরে ফেলেছিল। শার্লেমানের প্রিয় সহচর রোল্যাণ্ড বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে প্রভুকে বাঁচালেন, কিন্তু নিজে মৃত্যুবরণ করেন। রোল্যাণ্ডের বীরত্বের কাহিনী, জার্মানীর লোকগাথায় আজও অমর হয়ে আছে।

শার্লেমানের সাম্রাজ্য

শার্লেমান প্রায় সমস্ত জার্মান উপজাতিকে তাঁর অধীনতা স্বীকারে বাধ্য করেছিলেন। রাজনৈতিক অরাজকতা দমন করে এবং সুষ্ঠু প্রশাসনের ব্যবস্থা করে শার্লেমান পশ্চিম ইউরোপের মঙ্গলসাধন করেছিলেন। তাঁর খ্যাতি সুদূর বাগদাদেও পৌঁছেছিল। বাগদাদের সেই সময়কার খলিফা হারুন-অল-রসিদ তাঁকে একটি হাতি ও জল-ঘড়ি পাঠিয়েছিলেন।

অভিষেক ও সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা

৮০০ খ্রীস্টাব্দে রোমের সেণ্ট পীটার গীর্জায় শার্লেমানের অভিষেক হয়েছিল। পোপ তৃতীয় লিও বেদীর সামনে নতজানু হয়ে প্রার্থনারত শার্লেমানের মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিয়ে তাঁকে পবিত্র রোম সম্রাট অগাস্টাস শার্লেমান বলে সম্বর্ধনা জানান। শার্লেমান পোপকে তাঁর শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। এর প্রতিদানে তিনি

শার্লেমানকে সম্রাট পদে অভিষিক্ত করেন। শার্লেমান পোপের সহযোগিতায় সম্রাট হয়ে জার্মান রাজ্যকে সাম্রাজ্যের স্তরে নিয়ে যেতে আগ্রহী ছিলেন। প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের আইন ও শৃঙ্খলার স্মৃতি তখনও লোকের মন থেকে মুছে যায় নি। সুতরাং সকলে উল্লসিত চিত্তে মনে করল যে, রোমের পুনরুত্থান হয়েছে। প্রকৃত-পক্ষে শার্লেমান কিন্তু মনেপ্রাণে ফ্র্যাঙ্কই রয়ে গেলেন, কেবল, তাঁর রাজ্যের ও তাঁর নতুন নামকরণ হল। রাইন নদীর তীরে অবস্থিত রাজধানী আকেনের নাম হল নতুন রোম। ঐতিহাসিকেরা এই অভিষেককে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে বর্ণনা করেছেন। রোমের পতনের পর যে-অরাজকতা চলছিল তার অবসান ঘটল। জনসাধারণ আবার রাজনৈতিক ঐক্য ও সামাজিক নিরাপত্তা ফিরে পেল। সম্রাট ধর্মীয় গুরু পোপের নির্বাচিত প্রতিনিধি বলে গণ্য হলেন। সুতরাং শক্তিশালী রাজন্যবর্গ ও সামন্তদের বিদ্রোহের আশঙ্কা অনেক পরিমাণে দূরীভূত হল। এই পুনরুত্থানে জার্মানদের সম্মান বৃদ্ধি পেল, কারণ শার্লেমান ছিলেন জার্মান। তিনি পূর্ব রোমান সম্রাটের সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী বলে গণ্য হলেন। পোপের রক্ষাকর্তা হিসাবেও তাঁর সম্মান বৃদ্ধি পেল। এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার ফলে জার্মান জাতির শৌর্য ও রোমের কৃষ্টি—এই দুই-এর সমন্বয়ে এক উন্নততর সভ্যতার সূত্রপাত হল। প্রাচীন রোমক সাম্রাজ্যের প্রশাসন ও সংস্কৃতির উচ্চমান মধ্যযুগের সাম্রাজ্যকে অনুপ্রাণিত করবে বলে আশা করা হত। প্রশাসনের ক্ষেত্রে শার্লেমান রোমান ও জার্মান বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। শার্লেমান-প্রতিষ্ঠিত পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য মধ্যযুগে পশ্চিম ইউরোপের কেন্দ্রবিন্দু ছিল।

তবে শার্লেমানের অভিষেক ভবিষ্যতের জন্য অনেক সমস্যারও সৃষ্টি করল। জার্মানীর রাজাদের মনে বদ্ধমূল ধারণা জন্মাল যে, ইটালী জয় করা তাঁদের অবশ্য কর্তব্য। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তাঁরা পরবর্তী কালে অনেক শক্তি ক্ষয় করেছিলেন! জার্মানীর অগ্রগতির পক্ষে এর ফল শুভ হয় নি। পোপ ও চার্চের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পেল, কারণ পরবর্তী কালে পোপরা ধরে নিলেন যে, তাঁরা স্বীকৃতি দিলে তবেই সম্রাট বৈধভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন। পরবর্তী যুগে সম্রাট ও পোপের মধ্যে কে অধিক ক্ষমতাশালী এই

প্রশ্ন সমাধানের জন্য দীর্ঘকালব্যাপী বিরোধ চলেছিল। অবশ্য শার্লেমানের যুগে এই সমস্যার অস্তিত্ব ছিল না, কারণ পোপের তুলনায় তিনি অনেক বেশি শক্তিশালী ছিলেন। অনেক ঐতিহাসিকের মতে শার্লেমানের অভিষেক তেমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নয়। মধ্যযুগের ইতিহাসে আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা দেখা যায়—যেমন, সম্রাট ও পোপের বিবাদ, ধর্মযুদ্ধ, সাংস্কৃতিক নবজাগরণ প্রভৃতি। তা ছাড়া, শার্লেমানের সাম্রাজ্য আয়তনে অত্যন্ত ছোট ছিল এবং প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে এর তুলনা করা যায় না। শার্লেমানের মৃত্যুর পর এই সাম্রাজ্য আরও দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

রাষ্ট্র ও ধর্ম

শার্লেমান খ্রীস্টধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা দিয়ে ইউরোপে প্রথম ধর্মভিত্তিক রাজ্যের পথপ্রদর্শক বলে পরিগণিত হন। তিনি রাষ্ট্র ও ধর্মকে আলাদা করে দেখেন নি। এ বিষয়ে তিনি প্রাচীন যুগের খ্রীষ্টীয় সাধু আগাস্টিনের আদর্শ অনুসরণ করেছিলেন। তাঁর মতে ঈশ্বরের নির্দেশ পালন করাই প্রত্যেক মানুষের সবচেয়ে বড় কর্তব্য। এ বিষয়ে রাজা ও পোপের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। সুতরাং ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে রাজা ধর্মরক্ষা এবং ধর্মীয় ব্যাপার পরিচালনা করতে পারেন। অভিষেকের পর শার্লেমান তাঁর ঐশ্বরিক ভূমিকা সম্পর্কে আরও সচেতন হন। খ্রীস্টধর্মের প্রচারে তিনি সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। এমন কি স্যাকসনদের খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করানোর জন্য অত্যন্ত নিষ্ঠুর পন্থা অবলম্বনেও তিনি ইতস্তত করেন নি ; এ ছাড়া, চার্চের কার্যকলাপের উপর তিনি লক্ষ্য রাখতেন। চার্চের উপরে নিজের প্রাধান্য বজায় রাখতে তিনি সচেষ্ট ছিলেন। ধর্মযাজকদের নিয়োগ ও তাঁদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা রাজার ছিল। চার্চের সম্পত্তির বিলিব্যবস্থার উপরও রাজার পূর্ণ অধিকার ছিল। রাজা ধর্মসভা বা সিনড আহ্বান করতেন। শার্লেমান পোপের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর যুগে শক্তিশালী ও উচ্চাভিলাষী পোপের অভাব ছিল। তা ছাড়া, চার্চ রক্ষার জন্য পোপের পক্ষে শক্তিশালী রাজার প্রয়োজন ছিল। অবশ্য পরবর্তী যুগের সম্রাটরা শার্লেমানের মত পোপের উপর নিরঙ্কুশ আধিপত্য প্রয়োগ করতে সক্ষম হন নি।

শার্লেমান সাহিত্য ও শিল্প-সংস্কৃতির অনুরাগী ছিলেন। প্রথম

জীবনে লেখাপড়ার বিশেষ সুযোগ তিনি পান নি, কিন্তু নিজের উৎসাহে ও চেষ্টায় এবং আলোচনার মাধ্যমে ও লোকমুখে শুনে তিনি নানা বিষয়ে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তাঁর পার্শ্বচরেরা অবসর সময়ে তাঁকে নানা বই পড়ে শোনাতেন। তাঁদের মধ্যে আইনহার্ডের নাম প্রসিদ্ধ। তিনি নিজের চেষ্টায় ল্যাটিন, জার্মান ও গ্রীক ভাষা শিখেছিলেন। সমসাময়িক বহু মনীষী তাঁর সভা অলঙ্কৃত করেছিলেন। সাহিত্য, দর্শন, ব্যাকরণ, শিল্পকলা প্রভৃতির উৎকর্ষ এই যুগকে সমৃদ্ধ করে তোলে। তাঁর উৎসাহে ফ্র্যাঙ্ক জাতির গরিমা নিয়ে রচিত সব লোকগাথা সুসংবদ্ধ ও লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। তিনি হাতে লেখা প্রচুর পুথির অনুলিপি তৈরি করান। তাঁর সময়ে ল্যাটিন ও জার্মান ভাষায় ব্যাকরণের প্রামাণ্য বই রচিত হয়। ইতিহাস রচনা এবং পূর্ববর্তী মহৎ লোকদের জীবনী-সংরক্ষণের কাজ অনেকটা অগ্রসর

রাজ-আনুকূল্য এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির অগ্রগতি

হয়। ঐতিহাসিক আইনহার্ড শার্লেমানের জীবনী রচনা করেছিলেন। বিদ্যার প্রসারের জন্য তিনি বিভিন্ন খ্রীস্টান মঠে শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন। এ ব্যপারে তিনি থিওডোলফ নামে এক বিশপের সাহায্য পেয়েছিলেন। যাজকদের মধ্যে বিদ্যার চর্চা সম্বন্ধে তিনি অ ত্য ন্ত সচেতন ছিলেন। রাজপ্রাসাদে অভিজাতদের শিক্ষার জন্য তিনি একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এটি 'প্যালেস স্কুল' নামে বিখ্যাত। তিনি ইংল্যাণ্ড থেকে অ্যালকুইন নামে একজন বিখ্যাত বিদ্বান ব্যক্তিকে নিজের দেশে আমন্ত্রণ করে আনেন। এ ছাড়া, আয়ার্ল্যাণ্ড, ইটালী প্রভৃতি রাজ্য থেকে বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে তিনি আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন। অ্যালকুইনের ব্যাকরণ, ছন্দ ও বানান সম্বন্ধীয় বই, পলের লম্বার্ডির ইতিহাস এই সময়ের বিখ্যাত রচনা। তাঁর সময়ে

অ্যালকুইন

যুক্তিবাদী দার্শনিক জন-এর নামও প্রসিদ্ধ। ল্যাটিন ও জার্মান ভাষায় রচিত সাহিত্য ও কাব্য তাঁর আমলে সমৃদ্ধ হয়েছিল। শার্লেমানের উৎসাহে গ্রীক ও রোমান যুগের অনেক পুথি সংশোধিত হয়, কারণ আদি পুস্তকগুলির প্রচলিত অনুলিপিতে অনেক ভুল ছিল। অ্যাকেনের গীর্জা এবং নিমওয়েগেন, অ্যাঙ্গেলহ্যাম প্রভৃতি শহরে নির্মিত প্রাসাদ স্থাপত্য শিল্পে উন্নতির নিদর্শন। এই সময়ের স্থাপত্যে রোমানেস্ক-রীতির প্রচলন হয়েছিল। মাইনজ-এর সেতু ও রাইন-দানিয়ুব সংযোগকারী খাল সে যুগের পূর্তবিদ্যার উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

মধ্যযুগের ইতিহাসে শার্লেমান অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। জাতিতে বর্বর হলেও তিনি প্রাচীন রোমের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবদানের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে রোমান ও জার্মান সংস্কৃতির সংমিশ্রণে পশ্চিম ইউরোপে এক নতুন সংস্কৃতির সূচনা হয়েছিল। রাজ্যজয় ও দক্ষ-প্রশাসনের সাহায্যে তিনি অন্ধকার যুগের অরাজকতার অবসান ঘটিয়েছিলেন। তাঁর উৎসাহে শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নতুন জোয়ার এসেছিল। যদিও এই নবজাগরণের মান যথেষ্ট উন্নত ছিল না, কিন্তু এই নবজাগরণের ফলেই পশ্চিম ইউরোপে জ্ঞানচর্চার পরিবেশ রচিত হয়েছিল। শার্লেমানের মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্যে ভাঙ্গন ধরলেও নানা দিক দিয়ে তিনি পরবর্তী ইতিহাসের ধারাকে প্রভাবিত করেছিলেন।

মধ্যযুগে মঠ, ধর্ম ও সংস্কৃতি

প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের কাল থেকেই বিভিন্ন অঞ্চলে মঠ প্রতিষ্ঠিত হতে লাগল। খ্রীস্টধর্মের আদর্শঅনুযায়ী সরল জীবনযাত্রার মাধ্যমে ধর্ম ও জ্ঞানচর্চাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য এইসব মঠের বিকাশ ঘটেছিল। দুজন মিশরীয় সাধু—অ্যান্টনি এবং প্যাকোমিয়াস মঠ-আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। তৃতীয় খ্রীস্টাব্দ থেকে এই আন্দোলন শক্তিশালীহতে থাকে। চতুর্থ খ্রীস্টাব্দে এ্যাথানাসিয়াস দুজন সন্ন্যাসীকে নিয়ে রোমে এসেছিলেন। পরবর্তী যুগে রোমের সম্রাট ও পোপ মঠ-আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। রোমের

মঠ-আন্দোলনের উৎপত্তি ও বিকাশ

বিশপদের উদ্যোগে সন্ন্যাসীরা ধর্মপ্রচার ও জ্ঞানচর্চায় মন দিয়েছিলেন।

যাজক সম্প্রদায়ের মধ্যে এক অংশ সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করতেন। তাঁরা একত্র হয়ে লোকালয় থেকে দূরে মঠ স্থাপন করে বাস করতেন। মঠে প্রবেশ করবার আগে তাঁরা শপথ করতেন যে, তাঁরা বিয়ে করবেন না ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করবেন। পুরুষ সন্ন্যাসীদের মঙ্ক ও মঠের অধ্যক্ষকে এ্যাবট বলা হত। সন্ন্যাসিনীদের বলা হত নান। তাঁরা নানারীতে থাকতেন। উপাসনা, বিদ্যাচর্চা, মঠের বাগানে বা ক্ষেতের জন্য দৈহিক পরিশ্রম তাঁদের অবশ্য কর্তব্য বলে গণ্য হত। চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয় পরিচালনা প্রভৃতি জনহিতকর কার্য এবং অতিথি ও দরিদ্র-সেবা তাঁদের প্রধান কর্তব্য ছিল। এই সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। এর মধ্যে পূর্বে উল্লেখিত বেনেডিক্টাইন সম্প্রদায় সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। পোপ গ্রেগরীর পৃষ্ঠপোষকতায় ইংল্যাণ্ড ও ইটালীর বিভিন্ন স্থানে বেনেডিক্টপন্থী মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। অষ্টম খ্রীষ্টাব্দে গল ও জার্মানীতে মঠের একাধিপত্য স্থাপিত হয়েছিল।

মঠে রাজা, সামন্ত বা অন্য ধনীরা বহু জমি ও মুল্যবান উপহার দিতে শুরু করায় মঠের ধনসম্পদ বেড়ে গেল ও মঠবাসীরা পরবর্তী কালে আদর্শচ্যুত ও বিলাসী হয়ে উঠলেন। এর পর আস্তে আস্তে রাজনৈতিক শক্তি মঠের যাজকদের নিয়োগে হস্তক্ষেপ শুরু করল। খ্রীস্টীয় দশম শতাব্দীতে মঠগুলি অবনতির চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল। এই সময়ে বার্গাণ্ডির ক্লুনি নামক স্থানে বেনেডিক্টাইন মঠের সাধুসম্প্রদায় মঠের দুর্নীতি শোধন করবার প্রচেষ্টা শুরু করেন (৯১০ খ্রীস্টাব্দ)। তাঁরা মঠের সন্ন্যাসীদের অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা, ব্রহ্মচর্য পালন, প্রার্থনা প্রভৃতির উপর জোর দিলেন। তবে তাঁরা দৈহিক পরিশ্রমকে খুব বেশি প্রাধান্য দেন নি। রাজশক্তি ও সামন্ততন্ত্রের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত করে ধর্মীয় সংস্থাগুলিকে স্বাধীনভাবে পরিচালনার মধ্য দিয়ে সেখানে আধ্যাত্মিক সাধনা ও জ্ঞানচর্চার পরিবেশ ফিরিয়ে আনা ক্লুনির আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল। ধর্মযাজকদের নির্বাচন ও নিয়োগে রাজশক্তির হস্তক্ষেপ ক্লুনির সমর্থকরা বাঞ্ছনীয় মনে করতেন না। তাঁরা মনে করতেন ধর্ম ও রাষ্ট্র

পরস্পরের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না। তাঁরা ধর্মকে আভ্যন্তরীণ প্রশাসনের দুর্নীতি থেকে মুক্ত ও স্বায়ত্তশাসিত করতে চেয়েছিলেন। তবে অনেকের মতে এই মনোভাব থেকেই পরবর্তী কালে পোপের নেতৃত্বে চার্চ রাজশক্তির উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। যাই হোক, ক্লুনিয়াকদের প্রচেষ্টায় মঠের পবিত্রতা অনেকাংশে ফিরে এসেছিল। পরবর্তী কালে সিস্টারসিয়ান, ফ্রানসিসকান, ডমিনিকান প্রভৃতি গোঁড়া সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়েছিল।

মঠ আন্দোলনের গুরুত্ব

মধ্যযুগে সভ্যতার অনেক কিছুই মঠগুলিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। এখানে বিদ্যার চর্চা হত। এইসব মঠ রাজনৈতিক কোলাহল থেকে দূরে থাকত। মঠ-সংলগ্ন গ্রন্থাগারে বহু মূল্যবান পুথি সংরক্ষিত হত। পুথি হাতে নকল করা ছিল সন্ন্যাসীদের অন্যতম প্রধান কাজ। মঠ থেকে সাধারণ মানুষ বিদ্যালয়-পরিচালনা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করেছিল। এইসব মঠ বিভিন্ন সময়ে সাংস্কৃতিক নবজাগরণের অগ্রদূত হিসাবে কাজ করেছিল।

অবশ্য সামাজিক ও নাগরিক জীবন থেকে দূরে থাকায় তৎকালীন সমস্যাগুলির সঙ্গে মঠগুলির বিশেষ পরিচয় ছিল না। প্রথম দিকে মঠগুলি আন্তরিকভাবে খ্রীস্টধর্মের ভাল দিকগুলি তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছিল। কিন্তু তা করতে গিয়ে মঠগুলি অতীতের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে রইল এবং পরিবর্তিত যুগের সঙ্গে এগিয়ে যেতে ব্যর্থ হল। অনেক ক্ষেত্রে মঠের সন্ন্যাসীরা সার্বিক মুক্তি অপেক্ষা ব্যক্তিগত মুক্তিতে বেশি আগ্রহী ছিলেন। ক্লুনির মত আন্দোলন মঠকে সর্বতোভাবে পবিত্র করে তুলতে পারে নি। দুর্নীতি এবং বিলাসের বন্যায় অধিকাংশ মঠ ভেসে গিয়েছিল। সুযোগ-সন্ধানীরা খ্রীস্টধর্মের আবরণের সুযোগ নিয়ে মঠগুলিকে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে লাগল। ক্লুনির আন্দোলনের পর চার্চের সঙ্গে রাষ্ট্রের ক্ষমতার লড়াই শুরু হল এবং ধর্মসংস্কারের মূল উদ্দেশ্য চাপা পড়ে গেল। ইউরোপের ইতিহাসে নতুন নতুন বৈচিত্র্যের (যেমন, নাগরিক জীবনের বিকাশ ও ধর্মযুদ্ধ) আবির্ভাব মানুষের দৃষ্টিকে অন্যদিকে সরিয়ে নিল।

তথাপি মধ্যযুগের অরাজনৈতিক ইতিহাসে মঠগুলি গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা অনস্বীকার্য। ধর্ম ও সংস্কৃতির উচ্চ মান, নিয়মের অনুশাসন, সেবার আদর্শ, চার্চের ভূসম্পত্তির সুষ্ঠু পরিচালনা এবং ইতিহাস, আইন ও ধর্মশাস্ত্র নিয়ে গবেষণা—এইসব ক্ষেত্রে মঠগুলি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিল এবং ধর্মকেন্দ্রিক সভ্যতাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল।

ক্লুনির ধর্ম-আন্দোলন চার্চকে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে শক্তিশালী করে তুলেছিল। একাদশ শতাব্দীতে পোপ সপ্তম গ্রেগরী ঈশ্বরের ও ধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে পোপের শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করলেন। ফলে রাজশক্তির সবচেয়ে বড় প্রতিনিধি জার্মান সম্রাটের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠল। গ্রেগরীর যুক্তি অনুযায়ী সম্রাট ছিলেন পোপের সামন্ত মাত্র। খ্রীস্টধর্ম প্রবর্তিত হবার পর থেকে পশ্চিম ইউরোপে চার্চ ঐক্য ও সংস্কৃতির আদর্শ রক্ষা করে আসছিল। অবশ্য শার্লেমানের সময় থেকে সম্রাটরা পোপকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। উচ্চাভিলাষী পোপ গ্রেগরী ধর্মযাজকদের নৈতিক মান উন্নত করতে চেয়েছিলেন। তা ছাড়া, তিনি ধর্মযাজকদের নির্বাচনে রাজশক্তির হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করলেন। সম্রাট চতুর্থ হেনরীও কম শক্তিশালী ছিলেন না। আদর্শ ও ক্ষমতার সংমিশ্রণে এই সংঘর্ষ মধ্যযুগের ইতিহাসকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল।

রাষ্ট্র ও ধর্মের সংঘর্ষ

১০৭৫ খ্রীস্টাব্দে এই সংগ্রামের সূচনা হয়েছিল। ১০৮৫ খ্রীস্টাব্দে গ্রেগরীর মৃত্যু হলেও সংগ্রাম অব্যাহত ছিল। দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামে দু'পক্ষই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত ১১২২ খ্রীস্টাব্দে পোপ দ্বিতীয় ক্যালিক্সটাস এবং সম্রাট পঞ্চম হেনরীর আমলে ওয়ার্মস-এর সভায় এক চুক্তি সম্পন্ন হল। এই আপোস ব্যবস্থায় রাষ্ট্র ও ধর্মের নিজস্ব ক্ষমতার গণ্ডী নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। স্থির হয় সম্রাট অথবা তাঁর প্রতিনিধি ধর্মযাজকদের নির্বাচনে উপস্থিত থাকবেন, এবং বিরোধের নিষ্পত্তি করবেন, তবে সাধারণভাবে ধর্মযাজকদের নির্বাচনে রাজশক্তি হস্তক্ষেপ করবে না। এই ব্যবস্থার ফলে আপাতত শান্তি স্থাপিত হলেও সত্যিকারের সমাধান সম্ভব হয় নি। সম্রাটের বেশি ক্ষতি হল এবং জার্মান সাম্রাজ্যে ভাঙ্গন ধরল। পরবর্তী কালে শক্তিশালী পোপরা রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারও প্রয়োগ করতেন।

একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে জ্ঞানচর্চা

মধ্যযুগের প্রথম অধ্যায়ে বিভিন্ন মঠ ও ক্যাথিড্রাল জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হিসাবে সংস্কৃতির রক্ষক হয়েছিল। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক স্থায়িত্ব এবং যোগাযোগ-ব্যবস্থার উন্নতি শিক্ষার প্রসারের পথ সুগম করেছিল।

বিশ্ববিদ্যালয় — উত্তর ইউরোপে ক্যাথিড্রাল বিদ্যালয়গুলি পরিবর্ধিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আকার নিয়েছিল। মঠ-কেন্দ্রিক শিক্ষার গুরুত্ব কমে গিয়েছিল। গ্রামে পুরোহিতরা ধর্মীয় শিক্ষা দিতেন এবং সামন্ত আদালতগুলিকে কেন্দ্র করে আইনচর্চার কেন্দ্রগুলি গড়ে উঠেছিল। তা ছাড়া, পোপের নেতৃত্বে শক্তিশালী চার্চ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সমর্থক ছিল, কারণ ধর্মীয় প্রশাসনের জন্য শিক্ষিত মানুষের প্রয়োজন ছিল। রাজশক্তি এবং নতুন শহরগুলি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় অংশ নিয়েছিল। সম্রাট ও পোপ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে তাঁদের শিক্ষানুরাগের পরিচয় দিয়েছিলেন।

সবচেয়ে আগে স্যালেরনোর বিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়েছিল। উত্তরের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি প্রধানত ধর্মীয় শিক্ষার কেন্দ্র ছিল এবং শিক্ষকদের সংগঠন হিসাবে গড়ে উঠেছিল। প্যারিসের বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে উত্তর ও পূর্ব ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি স্থাপিত হয়েছিল। ইটালী ও স্পেনের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি (যথা, মোদেনা, রেগিও, নেপলস এবং স্যালামাঙ্কা) বোলোনার অনুকরণে গড়ে উঠেছিল। জার্মানীতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় (যথা, হাইডেলবার্গ) পরবর্তী যুগে স্থাপিত হয়েছিল। দক্ষিণের, বিশেষত ইটালীর বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ধর্মীয় সংগঠনের বাইরে গড়ে উঠেছিল এবং ধর্মীয় বিষয় ছাড়া অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রে পরিগণিত হয়েছিল। ১৩০০ খ্রীস্টাব্দে চৌদ্দটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র তিনটি রাজশক্তি এবং দুটি পোপের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

শিক্ষক-ছাত্রদের নিবিড় সম্পর্ক বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। ছাত্র-সমাবেশ অনেক ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কারণ ছিল। কোন কোন স্থানে শিক্ষকের কাছে এত ছাত্র-সমাগম হত যে, সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠত। শিক্ষকরা যৌথভাবে বসতি স্থাপন করলে সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়াপত্তন হত।

উদাহরণ হিসাবে কেম্ব্রিজের কথা বলা যেতে পারে। শিক্ষকরা শিক্ষাদানের বিনিময়ে ছাত্রদের কাছ থেকে অর্থ নিতেন। শিক্ষক ও ছাত্রকে নির্দিষ্ট নিয়মাবলী মেনে চলতে হত। তবে ছাত্রদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতার বিশেষ প্রচলন ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়-শহরে ছাত্রদের সঙ্গে স্থানীয় লোকদের মারামারি অনেক ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি করত। তবে সাধারণভাবে শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক ভাল ছিল।

সাংস্কৃতিক অগ্রগতি

শিক্ষকদের সঙ্গে ছাত্ররা বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করত। সুতরাং মধ্যযুগে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিশেষ ভূমিকা ছিল। বিশ্ব-বিদ্যালয় আন্দোলন দ্বাদশ শতাব্দীর সাংস্কৃতিক নবজাগরণের অবিচ্ছেদ্য অংশ। পশ্চিম ইউরোপে গ্রীকো-রোমান সংস্কৃতির চর্চা নতুন উদ্যমে শুরু হয়। ধর্মযুদ্ধ প্রাচ্য জগতের সঙ্গে ইউরোপের সংযোগ ঘটিয়েছিল। ফলে, ইউরোপের সাংস্কৃতিক ভিত্তি আরও প্রসারিত হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ নতুন শহর এবং নতুন বণিকসম্প্রদায় সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করে। অবশ্য এ বিষয়ে রাজশক্তি এবং ধর্মীয় শক্তির আনুকূল্য ছিল। ধর্মীয় সংগঠনের প্রয়োজনে ধর্মীয় আইনচর্চার বিকাশ ঘটে। রাজ্য প্রশাসনের স্বার্থে প্রাচীন রোমান আইনের (বিশেষত জাস্টিনিয়ানের আইন সংহিতা) পুনরভ্যুদয় হয়। রোমান আইনের চর্চা ইটালী থেকে উত্তরে প্রসারিত হল। পাডিয়াতে রোমান এবং লম্বার্ড-আইনের জন্য একটি বিদ্যালয় ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে ইরনেসিয়াস বোলোনাকে আইনচর্চার প্রধান কেন্দ্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ফ্রান্স এবং জার্মানীতেও রোমান আইন জনপ্রিয় হয়েছিল। এ ছাড়া, যুক্তিবাদ ও অনুসন্ধিৎসার প্রভাবে বিজ্ঞানের উন্নতি হয়। স্যালেরনো বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এ্যাবেলার্ড, এ্যারিস্টিপ্পাস, হারম্যান এবং আরও অনেকে বিভিন্ন গ্রীক ও রোমান রচনা অনুবাদ করেন। আঞ্চলিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে আইল্যাণ্ডের লোকগীতির উল্লেখ করা যেতে পারে। এর সব-চেয়ে খ্যাতনামা প্রতিনিধি ছিলেন স্টার্লসন। দক্ষিণ ফ্রান্সের কাব্য-গীতি যথেষ্ট উন্নত ছিল। উত্তর ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড ও জার্মানীর আঞ্চলিক সাহিত্য প্রাচীন উপকথায় সমৃদ্ধ ছিল। শিল্পের ক্ষেত্রে উত্তর ফ্রান্স, উত্তর ইটালী এবং ইংল্যাণ্ডে গথিক রীতির উন্নতি হয়েছিল।

এই যুগে 'স্কুলমেন' নামে পণ্ডিতদের এক গোষ্ঠী যুক্তির সাহায্যে ধর্মীয় ও গতানুগতিক বিষয় বিচার করে গ্রহণ করতেন। তাঁরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাকে সুসংবদ্ধ করে ধর্মশাস্ত্রের আওতায় নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন। তাঁরা ধর্ম ও বিশ্বাসের সঙ্গে যুক্তি ও বিজ্ঞানের মিলন ঘটাতে পেরেছিলেন। এ্যারিস্টটল প্রমুখ গ্রীক পণ্ডিতদের রচনাকে তাঁরা খ্রীস্টধর্মের মানদণ্ডে ব্যাখ্যা করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। প্রথমে ক্যাথিড্রাল বিদ্যালয় এবং পরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি তাঁদের কর্মক্ষেত্র ছিল। নবম খ্রীস্টাব্দে জন এই দৃষ্টিভঙ্গীর সূচনা করেছিলেন। পরে এ্যাবেলার্ড ও (১০৩৩-১১০৯ খ্রীস্টাব্দ), হিউ, পিটার, অ্যাকুইনাস এবং রজার বেকন এই মতবাদকে আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

সপ্তম অধ্যায়

সামন্ত প্রথা

খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতকে রোমান সাম্রাজ্যের পতন হয়। সেই সঙ্গে বিনষ্ট হয় পশ্চিম ইউরোপের শান্তি ও শৃঙ্খলা। শাসন-ব্যবস্থার অবনতির ফলে দস্যুরা অবাধে লুঠতরাজ শুরু করে দিল। সবলেরা নির্বিবাদে দুর্বলদের উপর অত্যাচার করতে লাগল। কৃষি-উৎপাদন বিপর্যস্ত হল, ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হল, সামাজিক জীবন বিপন্নহল এবং সংস্কৃতির অগ্রগতি বন্ধ হল। বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের পারস্পারিক সম্পর্ক ছিন্ন হল। আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার উপরে দেখা দিল বহিঃশত্রুর প্রাদুর্ভাব। উত্তর দিক থেকে নর্থমেন, পূর্বদিক থেকে ম্যাগিয়ার ও দক্ষিণের আরব জাতি ইউরোপের দেশগুলিতে আক্রমণ ও লুণ্ঠন শুরু করে। যদিও ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে জার্মান উপজাতিরা রাজ্য স্থাপন করেছিল কিন্তু তারাও সম্পূর্ণ শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে পারে নি।

উৎপত্তি ও বিকাশ

রাষ্ট্র-ব্যবস্থা দুর্বল ছিল বলে বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে সামন্ত প্রথার জন্ম হয়। রোমান সাম্রাজ্যের শেষ আমল থেকেই এর সূচনা

হয়েছিল। রোমান আমলের 'পেট্রোসিনিয়াম' ও 'প্রিকোরিয়াম'-নামক ব্যবস্থার মধ্যে সামন্ত-প্রথার উৎপত্তি দেখতে পাওয়া যায়। ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কৃষির গুরুত্ব অনেক বেড়েছিল। শক্তিশালী জমিদারেরা নিজ নিজ অঞ্চলের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভার নিলেন ও তার পরিবর্তে সাধারণ লোক তাঁদের প্রভুত্ব মেনে নিল। এই শক্তিশালী জমিদারেরা প্রভূত জমিজমার অধিকারী ছিলেন। তাঁরা নিজেদের প্রতিপত্তি বাড়াবার জন্য সাধারণ লোকদের আশ্রয় দিতেন ও কিছু জমি ইজারা দিতেন.। অনেক ক্ষেত্রে স্বাধীন চাষীরা নিরাপত্তার আশায় নিজেদের জমি শক্তিশালী জমিদারদের দিয়ে দিত এবং জমিদারদের কাছ থেকে জমি ইজারা নিয়ে চাষ করত। তদানীন্তন রাজারাও প্রশাসনিক ও সামরিক প্রয়োজনে জমিদারদের উপর নির্ভর করতে বাধ্য হতেন। ফ্রাঙ্ক রাজা চার্লস মার্টেলের আমল থেকে এই নিয়ম চালু হল যে, প্রয়োজন বোধে সামন্তগণ রাজ[illegible] সৈন্য দিয়ে সাহায্য করবে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গেছে, শক্তিশালী জমিদারেরা রাজার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে জমি দখল করে সর্বেসর্বা হয়ে বসেছেন। শার্লেমানের পরবর্তী যুগের রাজারা অনেক সময়ে রাজপুরুষদের নির্দিষ্ট বেতন না দিয়ে জমি বন্দোবস্ত দিতেন। কোন এলাকা কোন রাজ-পুরুষকে বন্দোবস্ত দিলে সে জমি এবং তৎসংক্রান্ত কার্যাবলী বংশগত হয়ে পড়ত এবং রাজপুরুষরা উত্তরাধিকার সূত্রে জমির মালিক রূপে পরিগণিত হতেন। নবম ও দশম খ্রীস্টাব্দে এভাবে সামন্ততন্ত্রের প্রসার হয়েছিল। ভাইকিং জলদস্যুদের আক্রমণও রাজাকে জমিদারদের উপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য করেছিল। সুতরাং সাধারণভাবে দুর্বল রাজশক্তির সঙ্গে সামন্ত প্রথার বিকাশের যোগ রয়েছে। রোমান

কৃষি-অর্থনীতি

সাম্রাজ্য ভেঙ্গে যাবার পর পশ্চিম ইউরোপের সামগ্রিক অর্থনীতির জায়গায় বিচ্ছিন্ন স্থানীয় অর্থনীতি গড়ে উঠেছিল। রাজনৈতিক অশান্তি ও যাতায়াতের অব্যবস্থার জন্য স্থলপথে ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভূমধ্যসাগরীয় যোগাযোগ-ব্যবস্থা মুসলমানদের হাতে চলে গেলে পশ্চিম ইউরোপের অর্থনীতি থেকে সামুদ্রিক বাণিজ্য বিদায় নিল। এই পরিস্থিতিতে জমি ছিল জীবনধারণের একমাত্র উপায়। 'ফিউডাল' কথাটি এসেছে 'ফিউডাম'

থেকে। রাজা যাঁকে ফিউডাম বা অধিকার দিতেন সাধারণ মানুষ আশ্রয় ও নিরাপত্তার আশায় তাঁকে প্রভু বলে মেনে নিত। জমি, জমিদার ও প্রজাকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট স্বয়ংসম্পূর্ণ এলাকা গড়ে উঠল। মধ্যযুগের এক-একটি রাজ্য এই ধরনের অনেক বড় ও ছোট জমিদারিতে বিভক্ত ছিল। সামন্ত প্রভুরা নিজেদের এলাকায় যথেষ্ট প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। বস্তুত, রাজার যা কাজ, অর্থাৎ অপরাধীর বিচার করা, তাদের শাস্তি দেওয়া, নিজের এলাকার প্রশাসন পরিচালনা করা ইত্যাদি দায়িত্ব সামন্ত প্রভুদের উপর ন্যস্ত হয়েছিল। সামন্তরা নিজেদের এলাকার প্রজাদের শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। আবার প্রজারা দরকার মত সামন্তদের হয়ে যুদ্ধ করত। সামন্ত প্রভুরাও অধিক শক্তিশালী সামন্ত বা রাজার প্রয়োজনে যুদ্ধে যেতে বাধ্য ছিলেন।

শ্রেণী বিভাগ

সামন্ত-সমাজকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়—সামন্ত প্রভু, যাজক-সম্প্রদায় ও কৃষক-সম্প্রদায়। এই কৃষকের মধ্যে একদল ছিল ভূমিদাস ও সার্ফ অথবা ভিলেন (villain), আর একদল ছিল স্বাধীন চাষী। ভূমিদাসদের জমি ছেড়ে কোথাও যাবার অধিকার ছিল না, কিন্তু স্বাধীন কৃষক ইচ্ছা করলে এক জমিদারের এলাকা ছেড়ে অন্য জায়গায় যেতে পারত। অবশ্য জমির অভাব ও অন্যান্য অসুবিধার জন্য জমি ছেড়ে অন্যত্র যাওয়ার ঘটনা বিশেষ ঘটত না। সাধারণভাবে ভূমিদাসদের অবস্থা খুব শোচনীয় ছিল। তারাই ছিল মধ্যযুগের শোষিত সম্প্রদায়। যাজক ও সামন্তরা ছিলেন প্রভুর শ্রেণীভুক্ত। তাঁরা সব রকমের আর্থিক ও সামাজিক সুবিধা ভোগ করতেন। অবশ্য তাঁদের মধ্যেও বিভিন্ন স্তর ছিল এবং স্তরভেদে করণীয় কর্তব্যও ছিল। সমাজে দুই অসমান ব্যক্তির পারস্পরিক চুক্তি বা বোঝাপড়ার উপর সামন্ত প্রথা প্রতিষ্ঠিত ছিল। দ্বিপাক্ষিক প্রয়োজনই ছিল এই চুক্তির মূল কথা। রাজা সামন্ততন্ত্রের ঊর্ধ্বতম স্তরে অবস্থিত ছিলেন। তারপরে যথাক্রমে ডিউক, ব্যারন, নাইট নামক বিভিন্ন স্তরের সামন্ত ও উপ-সামন্তরা ছিলেন। সমাজের সর্বাপেক্ষা নীচের তলায় ছিল সার্ফ ও ভিলেন প্রমুখ কৃষক ও ভূমিদাস। দেশের প্রশাসনের দায়িত্ব রাজাকে নিতে হত। সবচেয়ে বড় জমিদার হিসাবে তাঁর কিছু নিজস্ব খাস

জমি থাকত। তিনি রাজ্যের বাকী জমি কয়েকজন প্রধান সামন্তের মধ্যে বণ্টন করতেন। প্রধান সামন্তরা আবার সেই জমির কিছু অংশ দিতেন তাঁদের অধীনস্থ কয়েকজন উপসামন্তকে। তাঁরা নীচু তলার সামন্তদের সঙ্গে চুক্তি করতেন। বিভিন্ন স্তরের সামন্তরা কিছু জমি নিজের খাস দখলে রেখে দিতেন। রাজা সামন্তদের এই শর্তে জমি দিতেন যে, কোন যুদ্ধবিগ্রহ লাগলে সামন্তরা নিজেদের সৈন্য
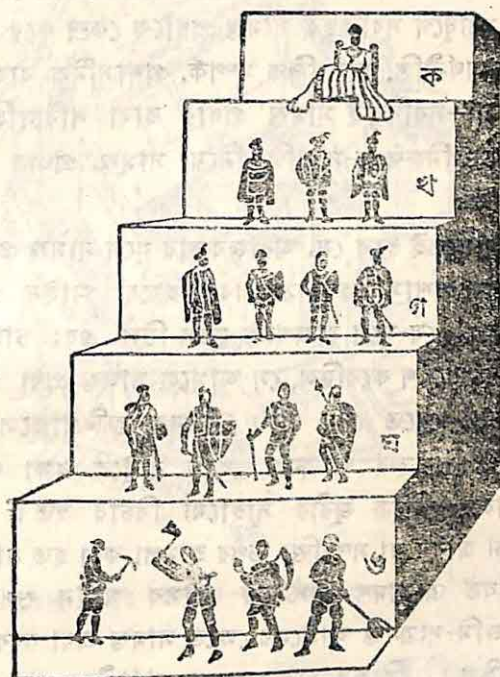
সামন্ত সমাজে শ্রেণীবিভাগ

এনে রাজার অধীনে যুদ্ধ করবেন ও নিজেদের এলাকার প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করবেন। এই ধরনের চুক্তি সর্বস্তরে দুই সামন্তের সঙ্গে করা হত। সর্বনিম্ন স্তরে সামন্তের সঙ্গে প্রজাদের চুক্তি হত। বড় সামন্ত ছোট সামন্তকে নিরাপত্তার আশ্বাস দিতেন এবং জমি বিলি করতেন। তার বদলে ছোট সামন্ত যুদ্ধ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বড় সামন্তকে সাহায্য করতেন। শত্রুর হাতে বড় সামন্ত বন্দী হলে ছোট সামন্ত অর্থ দিয়ে তাঁকে মুক্ত করতেন।

সম্রাট শার্লেমানের পর সামন্ত-প্রথা বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে

পড়তে থাকে। প্রভু ও চাষীর মধ্যে যে-চুক্তি হত, তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব ছিল। আবার বিভিন্ন সামন্ত পরস্পরের সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হতেন। দশম থেকে একাদশ খ্রীস্টাব্দ সামন্ত প্রথার চরম বিকাশের কাল। অবশ্য সামন্ত প্রথার ধরন দেশ ও অঞ্চল অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন হত, যদিও মূল বৈশিষ্ট্যগুলির ক্ষেত্রে কোন প্রভেদ ছিল না। মধ্যযুগে সবকিছুই সামন্ত প্রথাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হত। কৃষি, অর্থনীতি, সামাজিক সম্পর্ক, প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং যুদ্ধ পরিচালনা—সবকিছুই সামন্ত প্রথার দ্বারা পরিচালিত হত। এমন কি, চার্চও নিজস্ব ভূ-সম্পত্তি নিয়ে সামন্ত প্রথার আওতায় এসে গিয়েছিল।

সামন্ত প্রথার ভূমিকা ও অবদান

এ কথা মানতেই হবে যে, অরাজকতার যুগে সামন্ত প্রথা অন্তত একটা সাময়িক প্রশাসনিক কাঠামোর সাহায্যে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করেছিল। যে-যুগে রাজশক্তি দুর্বল ছিল এবং চার্চের মধ্যে অনেক দুর্নীতি প্রবেশ করেছিল, সে আমলে সামন্ত প্রথা রাষ্ট্র এবং সমাজকে ভেঙ্গে যেতে দেয় নি। অনেক ত্রুটি থাকলেও সামন্ত-সৈন্যবাহিনী বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রাষ্ট্রকে রক্ষা করেছিল। সামন্ত-আদালতগুলিতে জুরীর সাহায্যে বিচার হত। আইনের প্রয়োগ ছাড়া জীবন বা সম্পত্তির উপর হামলা করা হত না। পরবর্তী কালে, বিশেষত ত্রয়োদশ খ্রীস্টাব্দে এইসব আইন সুসংবদ্ধ করা হয়েছিল। জমি-সংক্রান্ত আইনের ক্ষেত্রে সামন্ত প্রথা পরবর্তী যুগকে পথ দেখিয়েছিল। বিশেষ করে ফ্রান্স ও জার্মানীতে প্রভু ও প্রজার সম্পর্ক আইনের সাহায্যে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হত। সামন্ত প্রথায় ব্যক্তি এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। জমিদাররা শক্তিশালী হওয়ায় রাজার পক্ষে অত্যাচারী হওয়া সম্ভব ছিল না। বিভিন্ন দেশে জমিদাররা রাজাকে সংযত রাখতে পেরেছিলেন। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সামন্ত প্রথায় যোগদান করা বাধ্যতা-মূলক ছিল না, যদিও প্রয়োজনের তাগিদে চুক্তি হত। প্রত্যেকের সুবিধা ও দায়িত্ব সহজ ও সরল ব্যবস্থার উপর দাঁড়িয়ে ছিল। উঁচু ও নীচু সকলকেই চুক্তি পালন করতে হত। সামন্ত প্রথা মধ্যযুগের জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। বিভিন্ন অঞ্চলের

দুর্গকে কেন্দ্র করে স্থানীয় জীবনযাত্রা গড়ে উঠেছিল। স্থানীয় লোক-গীতি, চিত্রশিল্প এবং সামাজিক-জীবনের বিকাশ ঘটেছিল। প্রতি-রক্ষার দিক থেকে দুর্গগুলি অত্যন্ত মজবুত ছিল। পরবর্তী কালে এই
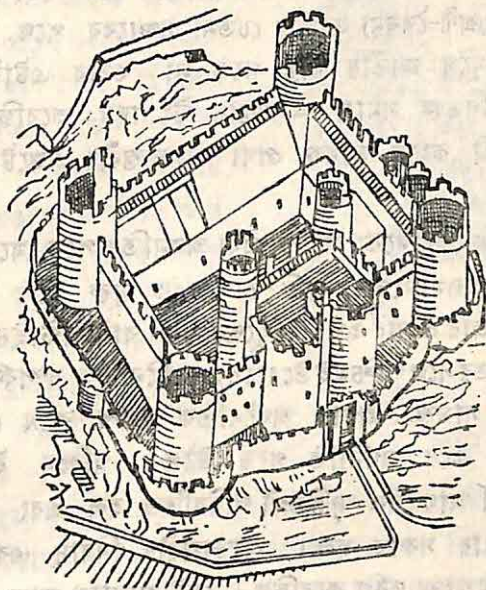
দুর্গ

সব দুর্গকে কেন্দ্র করে ব্যবসা-বাণিজ্য ও নাগরিক-জীবন গড়ে উঠেছিল।

এসব সত্ত্বেও সামন্ত প্রথার গুরুতর ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে আমরা উদাসীন থাকতে পারি না। শক্তিশালী রাজতন্ত্রের অভাব দেশে অরাজকতা ডেকে এনেছিল। শক্তিশালী সামন্তরা তাঁদের অঞ্চলে কার্যত স্বাধীন ছিলেন। তাঁরা স্থানীয় প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করতেন। এমন কি, চার্চও তাঁদের প্রভাবাধীন ছিল। রাজার নিজস্ব সৈন্যবাহিনী থাকত না। সুতরাং যুদ্ধের জন্য তাঁকে সামন্তদের পাঠানো সৈন্যের ওপর নির্ভর করতে হত। সাহায্যের বিনিময়ে সামন্তরা রাজার কাছ থেকে নানা সুযোগ-সুবিধা আদায় করতেন। সামন্তরা নিজেদের মধ্যেও ক্ষমতার লড়াই করতেন। ফলে রাজ্যে অরাজকতা

কুফল ও অবক্ষয়

লেগে থাকত। জার্মান সাম্রাজ্যে এই অরাজকতা চরম আকার ধারণ করেছিল। একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে স্বাভাবিক যোগাযোগ ছিল না। অর্থনৈতিক অগ্রগতি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। নিরাপত্তার পরিবেশ না থাকায় জনসাধারণের মনে হতাশার সঞ্চার হয়েছিল। শ্রেণী-বৈষম্য জাতীয় চেতনা সঞ্চারের পথে বাধাস্বরূপ ছিল। মধ্যযুগে জাতীয় রাষ্ট্র গড়ে না ওঠার এটাই প্রধান কারণ। বিভক্ত সমাজ অসন্তোষ উৎপাদন করেছিল। এর ফলে পরবর্তী কালে সামন্ত প্রথা আভ্যন্তরীণ সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছিল।

মধ্যযুগের শেষদিকে সামন্ত প্রথা অবনতির পথে যেতে থাকে। ভূমধ্যসাগর মুসলমানদের আধিপত্য থেকে মুক্ত হলে ইউরোপীয় ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হয়। ধর্মযুদ্ধের ফলে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য ও প্রাচ্য জগতের সঙ্গে পশ্চিমইউরোপের অর্থনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হল। ফলে সামন্ত প্রথার অর্থনৈতিক গুরুত্ব কমে গেল এবং শহরকে কেন্দ্র করে অর্থনীতি গড়ে উঠল। পশ্চিম ইউরোপের মানুষের সঙ্কীর্ণ আঞ্চলিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত হল এবং ধীরে ধীরে জাতীয় চেতনার সঞ্চার হল। আভ্যন্তরীণ বিবাদ এবং ধর্মযুদ্ধে অংশগ্রহণ সামন্তদের দুর্বল করেছিল। সেই সুযোগে ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশে শক্তিশালী রাজতন্ত্রের উদ্ভব হল। সামন্ত প্রথার অবক্ষয় আধুনিক যুগের সূচনা করল, কারণ সামন্তপ্রথাকে মধ্যযুগের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে মনে করা হয়ে থাকে। অবশ্য ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত প্রথা ইউরোপে দীর্ঘকাল বর্তমান ছিল।

সামন্ত প্রথার সঙ্গে 'শিভালরি' এবং নাইট সম্প্রদায়ের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ছিল। শিভালরি শব্দের মূল অর্থ অশ্বারোহী সৈন্য। কিন্তু পরবর্তী কালে শিভালরি শব্দটির দ্বারা এক সামরিক সম্প্রদায়কে বোঝাত। এই সম্প্রদায়ভুক্তদেরও নাইট আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। তাঁদের প্রধান লক্ষ্য ছিল ধার্মিক, আর্ত ও অত্যাচারিতদের রক্ষা করা। এই বীর যোদ্ধার দল বা নাইটরা সামন্ত সমাজের অলঙ্কার-স্বরূপ ছিলেন। নাইটরা উঁচু বংশ থেকে আসতেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র সামন্ত সমাজে সম্পত্তির প্রধান অংশের উত্তরাধিকারী হতেন। সাধারণত কনিষ্ঠ পুত্রেরা নাইট

শিভালরি এবং নাইট

হতেন। যাঁরা নাইট হতে ইচ্ছুক হতেন তাঁদের শিক্ষানবিশী বালক বয়স থেকে শুরু হত। সাত-আট বৎসর বয়স থেকে তাঁকে একজন সামন্ত প্রভুর কাছে শিক্ষা-নবীশ বা 'পেজ' হিসাবে রাখা হত। চৌদ্দ বৎসর বয়সে তাঁকে স্কোয়ার (Squire) পদে উন্নীত করা হত। তিনি প্রভুর সহচর রূপে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন এবং ঘোড়ায় চড়া ও অস্ত্রচালনা শিখতেন। তিনি প্রভুর সঙ্গে যুদ্ধ ক্ষেত্রেও যেতেন। শিক্ষা শেষ হলে একুশ বৎসর বয়সে এই শিক্ষার্থীরা নাইট হবার যোগ্যতা অর্জন করতেন। আড়ম্বরপূর্ণ ধর্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে 'নাইট' উপাধি দেওয়া হত। আনুষ্ঠানিক স্নানের পর নাইট হবার অনুষ্ঠান শুরু হত। এই স্নান ছিল শুচিতার প্রতীক। এই অনুষ্ঠানে নাইটের পোশাক হত সাদা জামা, লাল ঢিলা পোশাক ও কালো কোট। সাদা জামা ছিল সততার প্রতীক। লাল জামা বুঝিয়ে দিত যে, ঈশ্বরের নামে নিজের রক্তপাত করতেও তিনি দ্বিধা করবেন না। কালো কোট দ্বারা বোঝানো হত যে, নাইট মৃত্যুবরণ করতে ভয় পাবেন না। একদিন উপবাস করে সারারাত গীর্জায় প্রার্থনা ও পাপস্বীকার করতে হত। ধর্মযাজক তাঁকে নৈতিক, সামাজিক, সামরিক ও ধর্মীয় কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। নাইট পদপ্রার্থী উপদেশগুলি পালন করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতেন। তারপর কাঁধে একটি তরবারি নিয়ে তিনি গীর্জার বেদীর কাছে অগ্রসর হতেন। যাজক তরবারিটিকে নিয়ে সেটিকে আশীর্বাদ করতেন ও ফিরিয়ে দিতেন ; তরবারিটি নিয়ে প্রার্থী তাঁর উপবিষ্ট প্রভুর কাছে গিয়ে 'নাইট' উপাধি প্রার্থনা করতেন। প্রার্থীর কাছ থেকে আদর্শ পালনের প্রতিশ্রুতি পেলে প্রভু তাঁকে

নাইট

অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করাতেন এবং 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত করতেন। নাইট একটি বর্শা নিয়ে শিরস্ত্রাণ পরে ঘোড়ায় উঠে গীর্জার বাইরে যেতেন। তিনি স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ, শিশু, দুর্বল ও আর্তদের ধর্ম রক্ষা করবার শপথ নিতেন। তিনি সাহস ও নম্রতার সঙ্গে কর্তব্য পালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতেন। নাইটদের এই আদর্শকে 'শিভালরি' বলা হত। যুদ্ধে কেউ অসাধারণ বীরত্ব দেখালে তাঁকে আর একজন নাইট বিনা অনুষ্ঠানে নাইট উপাধিতে ভূষিত করতে পারতেন। নাইটরা অস্ত্র-প্রতিযোগিতায় যোগ দিতেন এবং কর্তব্যের আহ্বানে যুদ্ধ করতেন। সব নাইট যে এইসব আদর্শ সারা জীবন রক্ষা করতে সক্ষম হতেন তা নয়, কিন্তু এটা ঠিক যে, একটা মহৎ আদর্শ তাঁদের সামনে থাকত। নাইটদের কাছ থেকে সত্যের প্রতি নিষ্ঠা, পবিত্রতা, ভদ্রতা, উদারতা, বীরত্ব ও অতিথিপরায়ণতা আশা করা হত। এইভাবে জীবনযাপনের চেষ্টার ফলে জার্মানদের চরিত্রের উন্নতি হয়েছিল। মধ্যযুগের অরাজকতা ও হানাহানির মাঝখানে নাইটদের আদর্শ বা শিভালরির নিয়মাবলী এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম।

এই বীর নাইটদের সমাজের সব স্তরেই সম্মানের চোখে দেখা হত। এই যুগ ছিল বীরপূজার যুগ। নাইটদের বীরত্ব-কাহিনী নিয়ে চারণ কবিরা নানা গান তৈরি করতেন। ফরাসী দেশের চারণ কবিদের বলা হত 'ত্রোবাদুর' ও জার্মান দেশের কবিরা 'মিনিসিঙ্গার' নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁরা রাজা আর্থার ও তাঁর নাইটদের কাহিনী, শার্লেমান ও রোল্যাণ্ডের গাথা, সদাশয় দস্যু রবিন হুডের বীরত্ব-কাহিনী প্রভৃতি নিয়ে গান লিখতেন। এই গীতিকবিতাগুলি আঞ্চলিক ভাষায় রচিত হত। লোকগীতির উদ্দেশ্য ছিল স্বল্পশিক্ষিত জমিদার ও সাধারণ লোকদের আনন্দ দেওয়া। কখনও কখনও রাজারাও গান লিখতেন। রাজা রিচার্ড একজন ত্রোবাদুর ছিলেন। চারণ কবিরা স্থানীয় সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিলেন।

ত্রোবাদুর অথবা চারণ কবি

সামন্ত প্রথায় গঠিত গ্রামগুলিকে 'ম্যানর' আখ্যা দেওয়া হত। স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামগুলি সামন্ত প্রথার ভিত্তিস্বরূপ ছিল। অল্পসংখ্যক লোককে বাদ দিলে জনসাধারণ চাষবাস করেই জীবিকা নির্বাহ করত। সুতরাং বেশীর ভাগ লোকই গ্রামে বাস করত। নিরাপত্তার জন্য

চাষীরা সামন্ত প্রভুর বাড়ি (ম্যানর হাউস) বা তাঁর দুর্গের চারদিকে বসতি স্থাপন করত। বাইরের শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য তারা গ্রামকে প্রাচীর দিয়ে ঘিরে সুরক্ষিত করে রাখত। কোন কোন জমিদারদের একাধিক ম্যানর ছিল। তাঁরা পালা করে বিভিন্ন ম্যানরে বাস করতেন। তাঁদের অনুপস্থিতিতে কর্মচারীরা ম্যানরের তত্ত্বাবধান

ম্যানর প্রথার উৎপত্তি ও উদ্দেশ্য
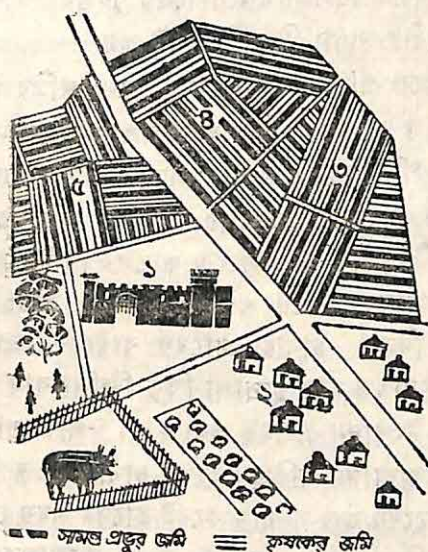
সামন্ত প্রভুর বাড়ি এবং চারপাশের কুটীর ও জমি

১। সামন্ত প্রভুর বাড়ি ; ২। কৃষকের কুটীর ; ৩। শীতকালে ব্যবহারের জমি ; ৪। অনাবাদী জমি ; ৫। বসন্তকালে ব্যবহারের জমি।

করত। ম্যানরের মধ্যে সামন্ত প্রভু সর্বেসর্বা ছিলেন। ম্যানরের প্রত্যেকে তাঁর অধীনস্থ ছিল। প্রজারা সামন্ত প্রভুর আদেশ মানতে বাধ্য ছিল। কোন অপরাধ সংঘটিত হলে সামন্ত জমিদারের কাছারীতে তার বিচার হত। জমিদার বিচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। এ ব্যাপারে তাঁরা রাজার স্থানীয় প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করতেন। স্থানীয় প্রশাসনে তাঁদের সিদ্ধান্তই ছিল শেষ কথা। অনেক সময়ে তাঁরা লঘু অপরাধে গুরু দণ্ড দিতেন এবং জরিমানার টাকা আত্মসাৎ করতেন। অবশ্য সুবিচারকেরও অভাব ছিল না।

ম্যানরগুলির অধিকাংশ অধিবাসী ছিল ভূমিদাস বা সার্ফ। কাগজে-কলমে ভূমিদাসদের অবস্থা রোমান আমলের ক্রীতদাসদের তুলনায় সামান্য কিছুটা ভাল ছিল। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তারা প্রভুর জমি ছেড়ে যেতে পারত না। জমি হস্তান্তরিত হলে তারাও হস্তান্তরিত হত। সামন্ত-প্রথা এবং ম্যানর প্রথা ভূমিদাসদের পরিশ্রমের উপর দাঁড়িয়ে ছিল। সংখ্যার দিক থেকে ভূমিদাসরাই ছিল সামন্ত সমাজের বৃহত্তম অংশ। এদের তুলনায় স্বাধীন চাষীর সংখ্যা ছিল নিতান্তই কম।

কৃষি ও কৃষক

চাষীদের প্রত্যেককে গ্রামের নানাদিকে ছড়ানো জমির অংশ দেওয়া হত। এর ফলে সমস্ত ভাল জমি বা সব খারাপ জমি কোন একজনের ভাগে পড়ত না। জমি বিতরণে একটা সমতা থাকত। চাষীরা সমস্ত জমি একসঙ্গে চাষ করত এবং তারপর যে যার ফসলের অংশ ভাগ করে নিত। স্বাধীন চাষী জমিদারকে ফসলের নির্দিষ্ট অংশ খাজনা হিসাবে দিত। অনেক সময়ে খাজনার বদলে তারা জমিদারকে বাধ্যতামূলক শ্রম দিত। চাষীরা গ্রামের বাইরের জগতের সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ রাখত না। দুষ্প্রাপ্য কিছু জিনিস বাদ দিলে নিত্য ব্যবহার্য জিনিসের উৎপাদন গ্রামেই করা হত। প্রতি গ্রামের নিজস্ব কারিগর থাকত। সারাদিন পরিশ্রম করেও চাষীরা কিন্তু বিশেষ কিছু পেত না ; জীবনধারণের জন্য সংগ্রাম করেই তাদের সময় কেটে যেত। চাষ করার পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত অনুন্নত, ফলে আশানুরূপ উৎপাদন হত না। আবার যা-কিছু উৎপাদন হত তার একটা মোটা অংশ জমিদারদের হাতে তুলে দিতে হত। তা ছাড়া পুরোহিত-সম্প্রদায়ের হাতে উৎপাদনের এক-দশমাংশ বা 'টাইথ' নামের খাজনা দিতে হত।

সামন্ত সমাজকে প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—অভিজাত সম্প্রদায়, যাজক সম্প্রদায় ও কৃষক সম্প্রদায়। সংখ্যায় কম হলেও সমাজে রাজার পরেই ছিল অভিজাতদের স্থান। অবশ্য সামন্তদের সবাই সমান ধনী ছিলেন না। সামন্তরা নিজেদের ম্যানরে বাস করতেন। গ্রামের সেরা জায়গায় সুরক্ষিত প্রাসাদ বা ম্যানর হাউস তৈরি করা হত। শত্রুর হাত থেকে রক্ষার জন্য নানারকম ব্যবস্থা ছিল। বেশীরভাগ প্রাসাদ ছিল দুর্গের মত। এইগুলি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা

সামাজিক শ্রেণীবিভাগ

থাকত। প্রাসাদের চারদিকে পরিখা থাকত। বাইরের জগতের সঙ্গে প্রাসাদের সংযোগ রাখার জন্য বিশেষভাবে তৈরি সেতু ব্যবহার করা হত। এই সেতুকে প্রয়োজনমত ওঠানো বা নামানো হত। ফটকের পাশে লোহার মই থাকত, কিন্তু দরকার মত তা তুলে ফেলা যেত। প্রাসাদের চারদিকে থাকত ছোট ছোট লোহার শিক দেওয়া জানালা। সেখান থেকে শত্রুকে লক্ষ্য করে তীর ছোঁড়া যেত। বিত্তশালী সামন্তদের প্রাসাদগুলি ছিল সাধারণত পাথরের তৈরি ও খুব জমকালো। প্রাসাদের অভ্যন্তরে দিবারাত্র অন্ধকার থাকত। মশাল আর মোমবাতির সাহায্যে অন্ধকার দূর করা হত। প্রাসাদের ভিতরে থাকত একটা বিরাট হলঘর। সেখানেই আদালত বসত এবং ভোজসভা হত। নক্সা-করা কাপড়ের ছবি বা ট্যাপেস্ট্রি দিয়ে ঘরের দেওয়াল সজ্জিত করা হত। আসবাবপত্র খুব বেশি থাকত না। এ ছাড়া, কয়েকটা শোবার ঘর থাকত। বৎসরের অনেকটা সময়ই সামন্তদের যুদ্ধবিগ্রহে ব্যস্ত থাকতে হত। শিকার ছিল সামন্ত-প্রভুদের অবসর বিনোদনের প্রধান উপায়। মাঝে মাঝে বিরাট ভোজের আয়োজন হত। তা ছাড়া, চারণ কবিদের গান, মল্লযুদ্ধ ও হাস্য-কৌতুকের ব্যবস্থা থাকত। নানারকম অস্ত্র-প্রতিযোগিতার চলন ছিল। তীর-ছোঁড়া অভ্যাস করা আবশ্যকীয় বলে গণ্য হত। সামন্তরা মোটা পশমের কাপড় পরতেন। আগুনে ঝলসানো শূকর, ষাঁড়, হরিণ ও নানা পাখির মাংস তাঁদের প্রিয় খাদ্য। তা ছাড়া পেঁয়াজ, বাঁধাকপি, শসা, গাজর প্রভৃতি সব্জী এবং আপেল, চেরী ইত্যাদি ফল তাঁদের খাদ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল।

যাজক-সম্প্রদায়ও সমাজে প্রতিপত্তিশালী শ্রেণী বলেই গণ্য হতেন। বিশেষত আর্চবিশপ, বিশপ ইত্যাদি উচ্চপদস্থ যাজক অনেক মর্যাদা ও সুবিধার অধিকারী ছিলেন। মধ্যযুগের চার্চ প্রচুর স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির অধিকারী ছিল। সুতরাং চার্চও বড় জমিদার হয়ে উঠল। চার্চ এই জমি অনেক সময় সামন্তদের মধ্যে বিলি করে দিত, আবার অনেক সময় ভূমিদাস রেখে চাষ করত। জমির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকার জন্য চার্চ ভূমিসমস্যার নানা দিক সম্পর্কে পরিচিত হবার সুযোগ পায়। এ ব্যাপারে সাধারণ জমিদারদের সঙ্গে চার্চের বিশেষ কোনও পার্থক্য ছিল না। অন্যান্য

জমিদারদের মত উচ্চপদস্থ ধর্মযাজকরাও বিলাসব্যসনের মধ্যে দিন কাটাতে আরম্ভ করলেন। এইভাবে চার্চের চরিত্রের পরিবর্তন ঘটল। প্রাথমিক আধ্যাত্মিক কর্তব্য ছেড়ে ধর্মযাজকরা পার্থিব বিষয়ে বেশি মনোযোগী হতে শুরু করলেন। অবশ্য বিষয়-সম্পত্তি-সংক্রান্ত সমস্যা থেকে চার্চকে মুক্ত করে ধর্মের পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য মাঝে মাঝে সংস্কার আন্দোলন হত। সাধারণ সামন্তরা স্থানীয় চার্চকে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করতেন। তাঁরা ধর্মযাজকদের নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করতেন এবং নিজেদের অনুগত গোষ্ঠীর জয়লাভে সচেষ্ট হতেন। এইভাবে যাজকরা নানা দিক থেকে সামন্ত প্রথার আওতায় এসে গিয়েছিলেন।

সার্ফ বা ভূমিদাসরা ছিল সমাজের নিম্নতম সম্প্রদায়। সংখ্যায় এরাই ছিল সবচেয়ে বড় সম্প্রদায়, কিন্তু উৎপাদন-ব্যবস্থায় এদের কোন স্বাধীন ভূমিকা ছিল না। ভূমিদাসরা ম্যানরে জমিদারের আশ্রয়ে বাস করত এবং একই জায়গায় তাদের জীবন অতিবাহিত হত। প্রাচীন রোমের ক্রীতদাস-সমাজ পরবর্তী কালে ভূমিদাস শ্রেণীতে পরিণত হয়েছিল বলে মনে করা যেতে পারে। রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলার ফলে শ্রমিকের অভাব দেখা দিয়েছিল। তখন জমির মালিকরা ক্রীতদাসদের কিছু জমি ইজারা দিয়েছিলেন। তাদের দিয়ে চাষবাস ও অন্য কাজ করানো হত। মালিক ইচ্ছামত তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করতে পারত। এ ছাড়া, বহু স্বাধীন কৃষক ঋণের দায়ে ভূমিদাস হতে বাধ্য হয়েছিল। ভূমিদাসরা ম্যানরে অল্প জমি পেত। যতদিন তারা চুক্তি অনুসারে কাজ করত ততদিন তাদের জমি ভোগ করবার অধিকার থাকত। জমির মালিকানা হস্তান্তরিত হলে তারা নতুন প্রভুর আওতায় আসত।

প্রভুর প্রতি ভূমিদাসদের নানারকমের কর্তব্য ছিল। তাদের বিভিন্ন কর দিতে হত। জমিদারের নিজস্ব জমিতে সপ্তাহে নির্দিষ্ট কয়েকদিন বিনা পারিশ্রমিকে তাদের চাষ করতে হত। এ ছাড়া, জমিদারের গরু, ভেড়া দেখা, ফসলতোলা, ঘরের কাজ করা, রাস্তাঘাট সারানো—সবই তাদের বিনা মজুরীতে করতে হত। নিজেদের জমি চাষ করবার জন্য খুব কম সময়ই তারা পেত। জমিদারের অনুমতি ছাড়া এক ম্যানরের ভূমিদাস অন্য ম্যানরের কারও সঙ্গে তার ছেলে

বা মেয়ের বিবাহাদি দিতে পারত না—কারণ ভূমিদাসের সংখ্যা কমে-যাওয়া সামন্তদের কাছে বাঞ্ছনীয় ছিল না। ভূমিদাস মারা গেলে তার উত্তরাধিকারীকে জমিদারের কর দিতে হত—না হলে নিজের জমি চাষের অনুমতি তাকে দেওয়া হত না। ভূমিদাসকে মালিকের রন্ধনশালায় রুটি তৈরি করতে হত, মালিকের কলে গম ভাঙ্গতে হত এবং আঙ্গুর পিষে মদ তৈরি করতে হত। প্রভুর পুকুরে মাছ ধরবার জন্য বা প্রভুর চারণ-ভূমিতে পশু চরাবার জন্য তাদের ভাড়া দিতে হত। ম্যানরের আদালতে বিচার চাইলে তাদের অর্থ দিতে হত। জমিদারের আদেশে তাদের যুদ্ধে যেতে হত। জমিদার যুদ্ধে বন্দী হলে মুক্তিপণের একটা বড় অংশ এদের থেকেই আদায় করা হত। জমিদারের ছেলের নাইট হবার উপলক্ষে এদের অর্থ দিতে হত। ভূমিদাসদের উত্তরাধিকারী না থাকলে মৃত্যুর পর জমিদার তাদের জমি নিয়ে নিতেন। চার্চের প্রতি ভূমিদাসদের একই রকমের দায়িত্ব ও কর্তব্য ছিল। তারা চার্চের জমিতে নিযুক্ত হত এবং ধর্মযাজকদের সেবায় ব্যস্ত থাকত। তারা চার্চকে নানা রকমের খাজনা দিত এবং বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবে নানা প্রকারের দায়িত্ব পালন করত।

এত পরিশ্রম করলেও ভূমিদাসরা স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল। তারা কাঠের অথবা পাথরের তৈরি অতি ছোট কুটীরে বাস করত, তাতে একটা অথবা দুটো ঘর থাকত। ঘর মাটি ও কাঠ দিয়ে তৈরি হত। আগুন লাগলে সব কিছু পুড়ে ছাই হয়ে যেত। একই বাড়ির মধ্যে তাদের গৃহপালিত পশু—শূকর, গরু বা বলদ থাকত। ভূমিদাসদের সম্পত্তি বলতে ছিল কাঠের লাঙল ও গৃহপালিত পশু। এদের ঘরে আসবাবপত্র কিছুই থাকত না। ভূমিদাসদের পরিবারের মেয়েদেরও যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হত। ঘরের কাজকর্ম করা, ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা, সুতো কাটা, কাপড় বোনা, এমন কি, চাষের কাজে সাহায্য করা ছিল মেয়েদের নিয়মিত কাজ।

চাষীদের খাদ্য ছিল মোটা আটার রুটি, শাক-সব্জী, শূকরের মাংস, ডিম ও গ্রাম্য মদ। শীতকালের জন্য তারা নোনা-মাংস জমিয়ে রাখত। চাষীরা সাধারণত তাদের বাড়ির চারপাশে সব্জী বাগান করত। তাদের সামান্য প্রয়োজন মেটাবার ব্যবস্থা করত তারা

নিজেরাই। স্ত্রী ও পুরুষ সকলে সুতির, পশমের বা চামড়ার পোশাক পরত।

ভূমিদাসরা ছিল নিরক্ষর। তাদের জীবনযাত্রা ছিল একঘেয়ে। একমাত্র রবিবার তাদের বিশ্রাম মিলত। সেদিন তারা গ্রামের গীর্জায় গিয়ে পুরোহিতের কাছে ধর্মোপদেশ শুনত ও প্রার্থনা করত। গীর্জাই তাদের জীবনে কিছু বৈচিত্র্যের সন্ধান দিত। মাঝে মাঝে উৎসব উপলক্ষে গীর্জার প্রাঙ্গণে জমা হয়ে তারা আমোদ-প্রমোদ ও নাচগান করত।

ভূমিদাসদের কথা চিন্তা করলে মধ্যযুগের সমাজ সম্পর্কে আমাদের ধারণা ভাল হতে পারে না। তাদের নিজস্ব অধিকার বলতে কিছু ছিল না। তারা সম্পূর্ণরূপে জমিদারের দয়ার উপর নির্ভরশীল ছিল, যদিও সামন্তদের দয়ার কোন নিশ্চয়তা ছিল না। ভূমিদাসদের অস্তিত্ব প্রভুর সঙ্গে জড়িয়ে ছিল। সত্যি কথা বলতে কি, তারা প্রভুর সম্পত্তি বলে গণ্য হত। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার সময়ে ভূমিদাসরা কিছুটা নিরাপত্তা প্রভুর কাছ থেকে পেত, কিন্তু তার বদলে তাদের অনেক দাম দিতে হত। দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, খ্রীস্টীয় ধর্মসংস্থা ভূমিদাসদের অবস্থার উন্নতির বিশেষ চেষ্টা করে নি। এর প্রধান কারণ, চার্চ সামন্ত প্রথায় অংশীদার ছিল এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শোষণের ভূমিকা নিয়েছিল। অবশ্য আদর্শবাদী ধর্মযাজকরা বিশেষ করে মঠের সন্ন্যাসীরা খ্রীস্টধর্মের সেবার আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন এবং দরিদ্রদের প্রতি করুণা বিতরণ করা ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করতেন। তা হলেও, ভূমিদাসদের অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয় নি। ভূমিদাসপ্রথা উত্তরাধিকার সূত্রে অব্যাহত ছিল।

এই অবস্থা থেকে স্বাভাবিকভাবেই মুক্তি পাওয়া সম্ভব ছিল না বলে ভূমিদাসরা নানাভাবে অব্যাহতি পাবার চেষ্টা করত। রাজশক্তি ভূমিদাস প্রথার সমর্থক ছিল বলে তারা ধর্মের আশ্রয় নিত, কারণ ধর্মের রাজ্যে রাজশক্তির পক্ষে হস্তক্ষেপ করা শক্ত ছিল। ভূমিদাসরা বিভিন্ন সংস্থায় যোগ দিয়ে ধর্মযাজকদের সংস্পর্শে আসত। ধর্মাচরণের কারণ দেখিয়ে তারা সামন্ত প্রথার দায়িত্ব থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করত। যেহেতু মধ্যযুগের সমাজ-জীবনে ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল, সেইজন্য ধর্ম মাঝে মাঝে তাদের উপকারে আসত। মঠ-আন্দোলন

এবং বিভিন্ন মঠের প্রতিষ্ঠা এ ব্যাপারে ভূমিদাসদের সামনে সুযোগ এনে দিয়েছিল। অনেক ভূমিদাস বেনেডিক্টাইন, সিস্টারসিয়ান ইত্যাদি সংঘে যোগ দিত। তবে তার বিনিময়ে সামন্তরা ক্ষতিপূরণ দাবী করতে পারতেন। দ্বাদশ শতাব্দী থেকে নতুন সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ভূমিদাস প্রথাকে দুর্বল করে ফেলেছিল। নতুন নতুন জনপদ ও নগর প্রতিষ্ঠার ফলে ভূমিদাসরা আশান্বিত হয়েছিল। নাগরিক জীবনের সামাজিক স্বাধীনতা ও উদার দৃষ্টিভঙ্গী তাদের গ্রাম ছেড়ে শহরে যেতে উৎসাহিত করেছিল। এইসব শহরে অর্থ উপার্জনের অনেক সুযোগ ছিল। ক্রমবর্ধমান নাগরিক প্রশাসনের জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজন ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য ও কারিগরি শিল্পের ভবিষ্যৎ কৃষিকার্য অপেক্ষা অনেক বেশি আশাপ্রদ ছিল। তা ছাড়া, নাগরিক সমাজ সামন্ত প্রথার শ্রেণীবৈষম্য থেকে মুক্ত ছিল। ভূমিদাসদের পক্ষে কাছাকাছি ম্যানরগুলি থেকে পালিয়ে বিভিন্ন শহরে আশ্রয় নেওয়া খুব শক্ত ছিল না। ধর্মযুদ্ধের ফলে ভূমিদাসদের পক্ষে পালিয়ে যাওয়া আরও সহজ হল। ধর্মযুদ্ধের নাম করে তারা ঋণ শোধ না করে দূরদেশে চলে যেত। এইসব ধর্মযোদ্ধার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া সামন্তপ্রভুদের পক্ষে শক্ত ছিল। তা ছাড়া, বেপরোয়া ভূমিদাসরা অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করত। জার্মানী, ফ্রান্স ও ইটালীতে এই ধরনের কৃষক-বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। যদিও উপযুক্ত সংগঠন এবং শক্তির অভাব ছিল এই সব বিদ্রোহে এবং শাসকশক্তিও কায়েমী স্বার্থের রক্ষক হিসাবে কাজ করেছিল, তা হলেও এই ধরনের প্রতিরোধ ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত প্রথাকে আরও দুর্বল করতে সাহায্য করেছিল।

অষ্টম অধ্যায়

ধর্মযুদ্ধ

খ্রীস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে জেরুসালেমের অধিকার নিয়ে ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ মধ্যযুগের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। প্যালেস্টাইনের অন্তর্গত জেরুসালেম খ্রীস্টানদের বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র।

প্রতি বৎসর দলে দলে তীর্থযাত্রীরা এই পবিত্র শহরে যেত। খ্রীস্টীয় সপ্তম শতকে আরবজাতি জেরুসালেম অধিকার করল। কিন্তু আরবরা খ্রীস্টানদের ধর্ম-আচরণে কোন বাধা দিত না। তীর্থযাত্রীরা নির্বিঘ্নে জেরুসালেম ঘুরে বেড়াত। অমুসলমানদের একটি বিশেষ কর দিতে হত। কিন্তু এর পরে সেলমুক তুর্কীরা একাদশ শতাব্দীতে আরবদের পরাজিত করে তাদের এশিয়ার সাম্রাজ্য দখল করে নিল। ইসলাম ধর্মাবলম্বী এই সেলজুক তুর্কীরা মধ্য এশিয়ার তাতার জাতিভুক্ত ছিল। আরবদের হারিয়ে তারা এশিয়া মাইনর দখল করে এশিয়া ও ইউরোপের দেশসমূহের বাণিজ্য বন্ধ করে দিল। তারা খ্রীস্টানদের উপরও নানাপ্রকার উৎপীড়ন শুরু করল। এরপর তাদের নজর পড়ল এশিয়া মাইনরের বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্ব অংশের দিকে। বাইজান্টাইন সম্রাট আলেক্সিয়াস কোমেনাস পোপ দ্বিতীয় আরবানের সাহায্য চাইলেন। পোপ দেখলেন যে, সপ্তম মাইকেলকে তুর্কীদের বিরুদ্ধে সাহায্য করলে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে পোপের সম্মান ও প্রতিপত্তি বেড়ে যাবে। আরও একটি সম্ভাবনার কথা তাঁর মনে ছিল। তিনি মনে করেছিলেন বিভিন্ন দেশের শক্তিশালী রাজা ও সামন্তরা ধর্মের নামে তাঁর নেতৃত্বে যুদ্ধ করবে। ফলে খ্রীস্টীয় জগতে তাঁর নেতৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। এছাড়া, ইটালীর বাণিজ্য-প্রধান শহরগুলিও তুর্কীদের পরাজিত করে বাণিজ্যের প্রসার চাইছিল। ভূমধ্যসাগর মুসলমানদের হাত থেকে মুক্ত হলে ইটালীর বাণিজ্য-প্রধান শহরগুলি (যথা—জেনোয়া, পিসা, ভেনিস) নৌ-শক্তির সাহায্যে পূর্বদিকে বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করতে লাগল। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের মুসলমান শক্তি রক্ষণ-মূলক নীতি অবলম্বনে বাধ্য হয়েছিল। সিসিলি নর্মানদের দখলে এলে মুসলমান জলদস্যুদের উপদ্রব বন্ধ হয়েছিল।

ধর্মযুদ্ধের কারণ ও উদ্দেশ্য

সুতরাং ধর্মের নামে যুদ্ধ হলেও বিভিন্ন উদ্দেশ্য এর পিছনে কাজ করেছিল। পোপের মত সম্রাট এবং রাজারাও তাঁদের প্রভাব বাড়াতে চেয়েছিলেন। প্রথম ফ্রেডারিকের মত সম্রাট ধর্মযুদ্ধে উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়েছিলেন। সামন্তরা তাঁদের সামরিক দক্ষতা প্রমাণ করতে উৎসাহিত হয়েছিলেন। অনেকে অজানা দেশে অভিযানে বৈচিত্র্য আশা করেছিলেন। ভূমিদাসরা দুঃখ ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তি

পাবার আশায় ধর্মযুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। তারা এবং স্বাধীন প্রজারা এই সুযোগে জমিদারের হাত থেকে পালাতে চেয়েছিল। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে বিধ্বস্ত হয়ে অনেকে প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ পূর্ব অঞ্চলে যেতে চেয়েছিল। বাইজান্টাইন সম্রাট এই সুযোগে পশ্চিম ইউরোপের সাহায্য নিয়ে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে রাজ্যবিস্তারে আগ্রহী হলেন। কয়েকটি ঘটনা ধর্মযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করেছিল। হাঙ্গেরীর অধিবাসীরা খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত হলে হাঙ্গেরীর মধ্য দিয়ে পূর্ব দিকে যাবার পথ প্রশস্ত হয়। ইটালীর শহরগুলি নৌশক্তি দিয়ে ধর্মযোদ্ধাদের সাহায্য করেছিল। সেলজুক সাম্রাজ্য ভেঙে গিয়ে ছোট ছোট তুর্কী রাজ্যের জন্ম হয়। তাদের পারস্পরিক বিবাদ ধর্মযোদ্ধাদের সাহায্য করেছিল। এইসব উদ্দেশ্য ও স্বার্থ ধর্মরক্ষার নামে সমবেত ও ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। সুতরাং ধর্মের গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য পশ্চিম ইউরোপে অনেক দিন আগেই খ্রীস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধ হয়েছিল।

ধর্মযোদ্ধার বেশে সম্রাট প্রথম ফ্রেডারিক

প্রথম ধর্মযুদ্ধে (১০৯৬-৯৯ খ্রীস্টাব্দ) জেরুসালেমে ল্যাটিন রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল। এছাড়া, বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য কিছুটা প্রসারিত হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয় ধর্মযুদ্ধ (১১৪৭-৪৯ খ্রীস্টাব্দ) শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে ধর্মযুদ্ধের উৎসাহ কমে গিয়েছিল। রাজারা তাঁদের রাজ্যের সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন।

বিভিন্ন ধর্মযুদ্ধ

জাতীয় রাজতন্ত্রের বিকাশ পোপের আধিপত্যকে খর্ব করেছিল। তাহলেও ১১৮৭ খ্রীস্টাব্দে সালাদিন কর্তৃক জেরুসালেম দখল পশ্চিম ইউরোপে উত্তেজনার সঞ্চার করেছিল। কিন্তু তৃতীয় ধর্মযুদ্ধে (১১৮৯-৯২ খ্রীস্টাব্দে) জেরুসালেম মুসলমানদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়নি। অবশ্য সালাদিনকে কিছুটা সংযত রাখা সম্ভব হয়েছিল এবং পোপ ইউরোপে আপাতত সমস্যামুক্ত

থাকতে পেরেছিলেন। চতুর্থ ধর্মযুদ্ধ (১২০২-০৪ খ্রীস্টাব্দ) পূর্ব ও পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পার্থক্যকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। ভেনিসের বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। পঞ্চম ধর্মযুদ্ধ (১২১৬-১৭ খ্রীস্টাব্দ) সাফল্যলাভ করে নি। ষষ্ঠ ধর্মযুদ্ধের সঙ্গে (১২৪৫-৫৪ খ্রীস্টাব্দ) ফ্রান্সের রাজা সেন্ট লুই জড়িত ছিলেন।

ধর্মযুদ্ধের প্রভাব সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। অনেকে মনে করেন, এতে অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তিক্ষয় ছাড়া কিছু হয় নি। মুসলমানদের কাছ থেকে প্যালেস্টাইন ছিনিয়ে নেওয়া সম্ভব হয় নি। তা হলেও ধর্মযুদ্ধের পরোক্ষ ফল সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। অনেকের মতে পূর্ব ও পশ্চিমের সংযোগ মানব সভ্যতার পক্ষে শুভ হয়েছিল। উন্নত মুসলমান সভ্যতা ইউরোপকে সমৃদ্ধ করেছিল। কিন্তু অনেকের মতে মুসলমান প্রভাব পূর্ব দিক থেকে না এসে সিসিলি ও স্পেন থেকে ধর্মযুদ্ধের আগেই এসেছিল। যাই হোক, ধর্মযুদ্ধ পশ্চিম ইউরোপের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করেছিল।

ধর্মযুদ্ধের ফল

ধর্মযুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়ে পোপ তাঁর ক্ষমতা বাড়াতে পেরেছিলেন। এই ক্ষমতা পোপ অনেক সময় ইউরোপে প্রয়োগ করতেন, যেমন করেছিলেন দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের বিরুদ্ধে। ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগে পোপ অনেককে শাস্তি দিতেন। পোপের প্রতিনিধিরা পূর্ব-অঞ্চলে নতুন নতুন ধর্মীয় ও সামরিক সংস্থা গঠন করেছিলেন। ধর্মযুদ্ধে ব্যয়-নির্বাহের জন্য পোপ সকলের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করতেন। ধর্মযুদ্ধের ফলে শিভালরির বিকাশ ঘটেছিল এবং নাইট বীরত্বের সঙ্গে নিজ কর্তব্য সম্পাদনের সুযোগ পেয়েছিলেন। ধর্মযোদ্ধাদের নৈতিক অধঃপতনের বিরুদ্ধে সাধু ফ্রান্সিস তাঁর আন্দোলন শুরু করেছিলেন। ধর্মযোদ্ধাদের জমি কিনে বিভিন্ন মঠ সম্পদশালী হল। ফলে মঠগুলি বিলাস ও উচ্ছৃঙ্খলতায় আক্রান্ত হল। যে-খ্রীস্টধর্মের নামে ধর্মযুদ্ধ হয়েছিল সে ধর্মের বিশেষ কোনও লাভ হয় নি। শেষ দিকের ধর্মযুদ্ধের সময় রাজারা পোপের অর্থনৈতিক ও অন্যান্য আদেশ মানতে অস্বীকার করতেন। পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপের চার্চের মধ্যে কোনও মিলন ঘটে নি। পশ্চিম এশিয়াতে মুসলমান আধিপত্য আরও শক্তিশালী হয়েছিল।

ধর্মযুদ্ধ পূর্ব-রোমান সাম্রাজ্যকে তুর্কী আক্রমণজনিতধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছিল। প্রথম ধর্মযুদ্ধের ফলে কনস্টান্টিনোপল রক্ষা পেয়েছিল। সভ্যতার পক্ষে এর ফল শুভ হয়েছিল, কারণ পূর্ব সাম্রাজ্যের সাংস্কৃতিক সম্পদ থেকে পশ্চিম ইউরোপ বঞ্চিত হয় নি। দুর্বলতা সত্ত্বেও জেরুসালেমের ল্যাটিনরাজ্য মুসলমানদের প্রতিহত করতে পেরেছিল। তুর্কী আক্রমণ প্রতিহত হওয়ার ফলে মধ্য ইউরোপের নবীন সভ্যতা আরও শক্তিশালী হবার সুযোগ পেয়েছিল। প্রথম দিকের ধর্মযুদ্ধ পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপের সম্পর্ককে ঘনিষ্ঠ করেছিল। কিন্তু ধর্মযোদ্ধারা বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যের ইউরোপীয় প্রদেশগুলিতে হামলা করলে সম্পর্কের অবনতি হয়। ১২০৪ খ্রীস্টাব্দে ধর্মযোদ্ধারা কনস্টান্টিনোপল দখল করলে পূর্ব-পশ্চিম সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠল। বিভিন্ন দেশের সামন্তরা ধর্মযুদ্ধেযোগ দিয়েছিলেন। ফলে রাজারা সামন্তদের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে রাজতন্ত্রকে শক্তিশালী করে। এ বিষয়ে ফ্রান্সের ক্যাপেসিয়ান রাজাদের কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য। প্রজারা যে-সব কর সামন্তদের দিত, ক্যাপে-সিয়ানরা সেগুলিকে রাজ-করে পরিণত করে। ধর্মযুদ্ধের ব্যয়-নির্বাহের জন্য সামন্তরা তাঁদের সম্পত্তি বিক্রি করতেন অথবা বাঁধা রাখতেন। যুদ্ধের পর ক্লান্ত ও নিঃস্ব হয়ে তাঁরা দেশে ফিরতেন। এইভাবে সামন্ত প্রথার অবক্ষয় জাতীয় রাজতন্ত্রের উত্থানে সাহায্য করেছিল। বিভিন্ন দেশের ধর্মযোদ্ধারা একসঙ্গে থাকার ফলে পারস্পরিক জাতীয় পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আরও সচেতন হয়েছিলেন এবং নিজের দেশের কথা ভাবতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন। অবশ্য পোপের শক্তিবৃদ্ধি জার্মানী ও ইটালীতে জাতীয় রাজতন্ত্র গঠনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

ধর্মযুদ্ধ ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করেছিল। বড় বড় শহর গড়ে উঠেছিল এবং বণিকগোষ্ঠীর গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল। বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্য ও পশ্চিম এশিয়ার মুসলমান দেশগুলির সঙ্গে পশ্চিম ইউরোপের শহরগুলির বাণিজ্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পশ্চিম ইউরোপের মধ্যে ইটালীর শহরগুলি জার্মান, ফরাসী ও ফ্লেমিস শহরগুলির সঙ্গে লাভজনক বাণিজ্য চালাত। ভেনিস, পিসা, জেনোয়া এবং মার্সাই পূর্ব অঞ্চলে

ব্যবসা করত। ১২০৪ খ্রীস্টাব্দে কনস্টান্টিনোপল অধিকার ভেনিসের পক্ষে সুবিধাজনক হয়েছিল। ১২৬১ খ্রীস্টাব্দে গ্রীকসাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে জেনোয়া বাণিজ্যের অনেক সুবিধা পেয়েছিল এবং ইউক-সাইনের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্পর্ক চালু করেছিল। ভেনিস ও জেনোয়ার বাণিজ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা ধর্মযুদ্ধের ফলে তীব্রতর হয়েছিল। ধনী শহরগুলি ধর্মযোদ্ধা, সামন্ত ও রাজাদের কাছ থেকে অনেক সুবিধা আদায় করেছিল। এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য করে ইটালীর শহরগুলি প্রভূত স্বর্ণমুদ্রা সঞ্চয় করেছিল। বিভিন্ন ব্যাঙ্ক গড়ে উঠেছিল এবং প্রত্যক্ষ কর (যথা, সালাদিন টিথি) প্রচলিত হয়েছিল। বাণিজ্যের প্রসার ক্ষুদ্র-উন্নয়নের সাহায্য করেছিল। তখন শ্রমিক, কারিগর ও ব্যবসায়ীদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্থায় বিভিন্ন জিনিসের উৎপাদন হত। এই সব জিনিস বাইরে পাঠিয়ে তার বদলে রেশম, মশলা, অলঙ্কার ইত্যাদি প্রাচ্য জগত থেকে নিয়ে আসা হত। অবশ্য কৃষি-অর্থনীতি তখনও প্রচলিত ছিল এবং অধিকাংশ লোককে জমির উপর নির্ভর করতে হত। ফ্রান্স ও জার্মানীতে কৃষির গুরুত্ব হ্রাস পায় নি।

ধর্মযুদ্ধ অপরিচয়ের প্রাচীর ভেঙে দিয়ে বিভিন্ন দেশ সম্পর্কে অনেক তথ্য ইউরোপকে দিয়েছিল। পশ্চিম ইউরোপের ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক পরিধি প্রসারিত হয়েছিল। এর ফলে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী উদার হয়েছিল। প্রাচ্য অঞ্চলের গল্প, কাব্য, ধর্ম ও ইতিহাস ইউরোপে অজানা রইল না। গণিতশাস্ত্র ও সামুদ্রিক আইনের বিকাশ হয়েছিল। শহর-কেন্দ্রিক সংস্কৃতি ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে অনেকটা মুক্ত ছিল। টায়ারের আর্চবিশপ উইলিয়ম তৃতীয় ধর্মযুদ্ধের ইতিহাস লিখেছিলেন। ধর্মযুদ্ধের অভিজ্ঞতা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিল। সামরিক-বিজ্ঞানের উন্নতি হয়েছিল। ধর্মযোদ্ধাদের অনুপস্থিতি সমাজে নারীজাতির দায়িত্ব ও অধিকার বাড়াতে সাহায্য করেছিল। ভূমিদাসদের ধর্মযুদ্ধে যোগদান এবং শহরে জীবিকার সন্ধানে চলে যাওয়া সামন্তপ্রথাকে দুর্বল করেছিল। সব মিলিয়ে ধর্মযুদ্ধকে কেন্দ্র করে ইউরোপে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আধুনিক যুগের সূচনা হয়েছিল।

নবম অধ্যায়

শহরের উৎপত্তি ও বিকাশ

মানুষ যখন চাষবাস করে প্রথম বসতি স্থাপন করল তখন তারা গ্রামে ছোট ছোট কুটীর তৈরি করে থাকত। কিন্তু যত দিন যেতে লাগল ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হল। তখন ব্যবসায়ীরা শহরে বাস করত। পরে কারিগররাও শহরে ভীড় করল। মধ্যযুগে অধিকাংশ লোকই চাষ-আবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করত। তারা গ্রামে বা ম্যানরে বাস করত। রোমের পতনের পর ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে রোমান শহরগুলিও ধ্বংসের মুখে পড়ল। তবে ছোট ছোট ব্যবসায়ীরা জিনিস-পত্র কাঁধে করে গ্রামে গ্রামে ফিরি করে বেড়াত। ক্রমে তাদের মধ্যে যারা বর্ধিষ্ণু তারা ম্যানর হাউস বা দুর্গের আশে-পাশে স্থায়ী বসতি স্থাপন করল। এগুলিকে বলা হত বার্গ এবং বার্গের অধিবাসীদের বলা হত বার্গার। নবম ও দশম খ্রীস্টাব্দে বহিঃশত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে নিরাপত্তার জন্য অসংখ্য বার্গ স্থাপিত হয়েছিল। এই সব বার্গ পরে স্থানীয় প্রশাসনের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। এই ভাবে ম্যানর হাউস বা দুর্গের আশে পাশে শহর তৈরি হল। নিরাপত্তার জন্য বার্গাররা সামন্তকে নিয়মিতকর দিয়ে যেত। তাদের জীবিকা নির্বাহের প্রধান উপায় ছিল কারিগরী শিল্প ও কারবার। এখানকার বাজারে বহু দূর দেশ থেকে পণ্যদ্রব্য আসত। গ্রামগুলি যদিও নিজেদের প্রয়োজনীয় জিনিস নিজেরাই উৎপাদন করত তবুও গ্রামবাসীরা লোহা, অস্ত্র, লবণ, মশলা ইত্যাদি কিনবার জন্য শহরের মুখাপেক্ষী ছিল। পরিবর্তে তারা নিজেদের উৎপন্ন দ্রব্য শহরে বিক্রি করতে নিয়ে আসত। শহরে পণ্যের ও টাকা পয়সার লেনদেন হত বলে শত্রু ও চোর ডাকাতের উপদ্রব লেগে ছিল। কাজেই দুর্গের চারধারে সামন্তের আশ্রয়ে থাকার দরকার ছিল। পরে শহরের চারদিকে উঁচু ও মজবুত ফটক লাগানো প্রাচীর থাকত। সশস্ত্র প্রহরীরা ফটক পাহারা দিত।

উৎপত্তি ও বিকাশ

বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন কারণে শহরের উৎপত্তি হয়েছিল।

প্রাচীন রোমান শহর অথবা চার্চ সংলগ্ন জনপদ অথবা কোনও মঠ–

অধ্যুষিত অঞ্চল পরে মধ্যযুগের শহরে পরিবর্ধিত হত। ইটালীর

র‍্যাভেনা শহর রোমান আমলে বর্ধিষ্ণু জনপদ ছিল। কিছু কিছু প্রাচীন রোমান শহর মধ্যযুগেও টিকে ছিল। চার্চকে কেন্দ্র করে জনপদ গড়ে উঠত, তার একটা অংশ ছিল কৃষিপ্রধান। এইসব জায়গার বিশপরা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের সুবিধা আদায় করতেন। মঠের সন্ন্যাসীরাও আশেপাশের অঞ্চলে কারিগর, শ্রমিক ও ব্যবসায়ীদের বসাতে লাগলেন। এইসব জনপদও স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পেতে লাগল।

ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার শহর আন্দোলনের মূল কথা। ব্যবসার বাজার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শহরের সংখ্যা বাড়তে থাকল এবং পুরাতন শহরগুলি বর্ধিষ্ণু হতে লাগল। বার্গারর। সামন্তদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সাফল্য লাভ করত। দুর্বল রাজশক্তি শহরের বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে নি। শহরের স্বচ্ছল বণিক সম্প্রদায় রাজা অথবা স্থানীয় সামন্তকে অর্থ দিয়ে স্বায়ত্তশাসন এবং অন্যান্য সুবিধা আদায় করত। ভূমিদাসরা কাজের আশায় সামন্তদের কাছ থেকে পালিয়ে আসত। ধর্মযুদ্ধ শহর-আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করল। ইটালীর শহরগুলি— ভেনিস, জেনোয়া, পিসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য এবং এশিয়ার মুসলমান দেশগুলির বাজারে প্রবেশ করল। ভূমধ্যসাগর মুসলমানদের আধিপত্য মুক্ত হলে নৌ-শক্তিতে সমৃদ্ধ এই শহরগুলির আরও সুবিধা হল। সামন্ত শক্তির অবক্ষয় শহরগুলিকে সাহায্য করেছিল।

শহরকে কেন্দ্র করে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল। বার্গের বাইরেও উপনগরী অথবা ফবার্গ গড়ে উঠল। চার্চ এবং মঠকেন্দ্রিক জনপদের আশেপাশেও একই ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। যাতায়াতের সুবিধা অনেক শহরের উন্নতির কারণ হয়েছিল। সাইন নদীর দুই ধারে প্যারিস শহর বিস্তৃত হয়েছিল। কোলোন শহরও নদীর ধারে গড়ে উঠেছিল। দক্ষিণ ইটালীর শহরগুলি ভূমধ্যসাগরের সুবিধা পেয়েছিল। উত্তর জার্মানীর শহরগুলিও জলপথের সুবিধা ভোগ করত। একাদশ শতাব্দীর শেষে সম্রাট এবং পোপের বিবাদ শহরগুলির সামনে আরও সুযোগ এনেছিল। অনেক জায়গায়, বিশেষত জার্মানী ও ইটালীতে শহরগুলি

সংঘবদ্ধ হয়ে নিজেদের শক্তি বাড়াত। সামরিক প্রয়োজনে শহরগুলি সৈন্যবাহিনী গঠনে মন দিয়েছিল। জার্মানীতে দুর্বল রাজতন্ত্র এবং সামন্তদের অরাজকতা শহরগুলির শক্তিবৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করেছিল। রাইন নদীর শহরগুলি (কোলোন, ওয়র্মস, স্পেয়ার, মাইঞ্জ এবং উত্তরে লুবেক, হামবুর্গ এবং ব্রেমেন) সনদ মারফৎ কর থেকে অব্যাহতি এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা পেয়েছিল। ধর্মযাজকরা আরও পরে শহরগুলিকে সুবিধা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। উত্তর ইটালী ও রাইন অঞ্চলের অনেক চার্চ ও মঠ-কেন্দ্রিক শহর বলপ্রয়োগের সাহায্যে সুবিধা আদায় করেছিল। সম্রাট তৃতীয় লোথার ভর্নব্যাকের মঠাধ্যক্ষকে সনদ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। অনেক ক্ষেত্রে সামন্তরা অর্থনৈতিক স্বার্থে নিজেদের জায়গায় শহর গড়বার অনুমতি দিতেন।

সম্রাট তৃতীয় লোথার-কর্তৃক ভর্নব্যাকের এ্যাবটকে সনদ প্রদান

শহরের বণিকরা নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য এবং পরস্পরকে সাহায্য করার জন্য সংঘবদ্ধ হল। সামন্ত প্রভুদের অন্যায় জুলুমের ভয় তো ছিলই, তার উপরে ছিল দস্যুর দৌরাত্ম্য। এরা ব্যবসা বাণিজ্যের নিয়ম তৈরি করত, সামন্তদের সঙ্গে দেয় শুল্কের হার নিয়ে দর কষাকষি করত এবং নিজেদের পণ্যদ্রব্য রক্ষার জন্য পাহারাদারি করত। এগুলিকে বলা হত ট্রেড গিল্ড বা বণিক সংঘ। ক্রমে নানা রকমের শিল্প ও নানাবিধ দ্রব্যের ব্যবসা শুরু হল। একটি বণিক সংঘের পক্ষে সব রকম ব্যবসার ভার নেওয়া আর সম্ভব হল না, তখন বিভিন্ন শিল্পের কারিগররা নিজেদের আলাদা সংঘ প্রতিষ্ঠা করল। পশম শিল্পী, স্বর্ণকার, চর্মকার—সকলেই নিজের সংঘ প্রতিষ্ঠা করল। এগুলিকে বলা হত ক্রাফট গিল্ড বা শিল্প সংহতি। এরা মুদ্রা প্রচলন এবং সৈন্যবাহিনী গড়বার ক্ষমতা লাভ করল। এই ভাবে নগরগুলি প্রায় স্বাধীন রাষ্ট্রের রূপ নিল। পরে নগরের ধনী ও শক্তিশালী

গিল্ড

কয়েকজন আস্তে আস্তে শহরের সর্বেসর্বা হয়ে বসল। এইরকম প্রায় স্বাধীন শহরের মধ্যে ইটালীর ফ্লোরেন্স, জেনোয়া, ভেনিস, মিলান এবং জার্মানীর লুবেক, হামবুর্গ প্রভৃতি বিখ্যাত। মাঝে মাঝে বিভিন্ন দেশের নগরগুলি নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সংঘবদ্ধ হত। এদের মধ্যে উত্তর ইটালীর লম্বার্ড লীগ, স্পেনের স্পানিস লীগ, জার্মানীর হানসিয়াটিক লীগ প্রভৃতি বিখ্যাত। কোন বিদেশী বাণিজ্য করতে চাইলে তাকে শুল্ক দিতে হত।

এইসব ক্রাফট গিল্ড বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনের সব নিয়ম-কানুন ঠিক করত। তারা প্রত্যেকটি জিনিসের দামও নির্ধারণ করত। যারা কোন বিশেষ বৃত্তি অবলম্বন করতে চাইত তাদের ওস্তাদদের কাছে থেকে শিক্ষানবিশী করতে হত। সাধারণত সাত বৎসর বয়স থেকে কারিগরী শিক্ষা শুরু হত। শিক্ষা শেষ হবার পর তারা কাজে যোগ দিত। এই গিল্ড বা গোষ্ঠী বৃদ্ধ বা অশক্ত কারিগরদের ভার নিত। তারা মৃত শিল্পীদের নাবালক ছেলেমেয়েদের দায়িত্ব নিত এবং বিধবাদের ভরণ-পোষণ করত।

মধ্যযুগের শহরগুলি বর্তমানের তুলনায় অনেক ক্ষুদ্র স্থানের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। লোকসংখ্যা ছিল খুব বেশি। রাস্তাগুলি সরু, আঁকা-বাঁকা, কোন জায়গা অসমান, পাথর বাঁধানো, কোন জায়গায় রাস্তা একেবারে কাঁচা—এই ছিল যোগাযোগ-ব্যবস্থা। রাস্তাগুলি ছিল অন্ধকার ও দুর্গন্ধময়। রাস্তার দুদিকে বড় বড় বাড়ি থাকত। এইসব বাড়ি ছিল অস্বাস্থ্যকর ও অন্ধকার। কাচের জানালা ছিল। রাত্রে মোমবাতি ব্যবহার করা হত। রাস্তা দিয়ে ঘোড়সওয়ার, গাড়ি ও পথিক যাতায়াত করত। সুতরাং সব মিলে বিশৃঙ্খলা ও গণ্ডগোলের শেষ ছিল না।

জীবনযাত্রা

শহরে নিয়মিত দূরত্বে সরাইখানা ছিল। এখানে ভবঘুরের দল আশ্রয় নিত। এ-ছাড়া বাজারগুলি ছিল সকলের আড্ডার কেন্দ্র। রাত্রেও সরাইগুলিতে আড্ডা ও হৈ-চৈ হত। দাঙ্গা-হাঙ্গামা শহরের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। এ ছাড়া দস্যু ও তস্করের উপদ্রব তো ছিলই। শহরবাসীরা প্রহরী নিযুক্ত করত, কিন্তু তাদের চোখ এড়িয়ে চোরদের উৎপাত লেগেই থাকত।

ব্যবসার প্রসার হবার ফলে বিত্তশালী শহরগুলি সামন্ত প্রভুদের

অধীনে থাকতে চাইছিল না। ইতিমধ্যে ধর্মযুদ্ধের ফলে তাদের প্রাধান্য আরও বেড়ে গেল। যেসব সামন্ত ধর্মযুদ্ধে যেতে ইচ্ছুক ছিলেন তাঁদের নগদ টাকার দরকার হত। শহরগুলি কখনও টাকা দিয়ে, কখনও বা জোর করে পৌরশাসনের অধিকার সামন্তদের কাছ থেকে আদায় করত। শহরবাসীরা নিজেদের মধ্যে থেকে উপযুক্ত লোক নির্বাচন করে তাদের হাতে শহরের শাসনভার অর্পণ করত। সবচেয়ে উচ্চপদস্থ পৌরপ্রশাসক ছিলেন মেয়র; তাঁকে সাহায্য করতেন অল্ডারম্যান নামে কর্মচারীরা। শহরগুলি প্রভুর কাছ থেকে সনদ বা চার্টার লিখিয়ে নিয়ে আইন তৈরি করবার অধিকার লাভ করত। শহরের চার দেওয়ালের মধ্যে বসবাসকারী নাগরিকদের নিয়ে সাধারণ সভা (পার্লামেণ্টো) গঠিত হত। কিন্তু এই সভা অত্যন্ত বড় ছিল বলে প্রশাসনিক অসুবিধা দেখা দিল। সুতরাং গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে ছোট পরিষদ গঠন করা হল এবং তাঁদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হল। তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়েগোপনীয়তা রক্ষা করতেন এবং কনসালকে পরামর্শ দিতেন। কনসালরা প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থা পরিচালনা করতেন। ১১৫০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে সম্রাটের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা কনসালদের হাতে চলে গিয়েছিল। সাধারণত শহরগুলিতে গণতন্ত্র অপেক্ষা অভিজাততন্ত্রের বেশি প্রচলন ছিল।

শহরগুলির ক্ষমতা-বৃদ্ধি ও স্বায়ত্ত-শাসন

প্রধান বাণিজ্য ও শিল্প-অধ্যুষিত অঞ্চলে (যেমন, উত্তর ও উত্তর মধ্য ইটালী, দক্ষিণ এবং উত্তর ফ্রান্স, রাইন অঞ্চল এবং ফ্লাণ্ডার্স) সুবিধাভোগী শহরগুলি অবস্থিত ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে নাগরিক স্বায়ত্তশাসন চরম আকার ধারণ করেছিল। কেবলমাত্র জার্মানীতে রাইন নদীর পূর্বদিকের শহরগুলি পিছিয়েছিল। জার্মানী ওইটালীতে কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতা শহরগুলিকে স্বায়ত্তশাসিত হতে সাহায্য করেছিল। কিন্তু ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডে শক্তিশালী রাজতন্ত্র নাগরিক স্বাধিকারের ক্ষেত্রে বাধা হয়েছিল। ফ্লাণ্ডার্স-এর কাউন্টরাও শহরগুলির উপর বাধা-নিষেধ আরোপ করেছিলেন।

শহরের জনসংখ্যাকে সাধারণভাবে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হত। বণিক সম্প্রদায় অথবা 'বার্গ' নতুন জনপদের সঙ্গে জড়িত ছিল।

এই নতুন শ্রেণী জমি ও কৃষির উপর নির্ভর না করে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত ছিল। এরাই বুর্জোয়া শ্রেণী বলে পরিচিত হল।

নাগরিক শ্রেণী

প্রথম দিকে 'মার্কেটের' এবং 'বার্গেনসিস' সমার্থক ছিল—অর্থাৎ বাণিজ্য ছিল এই শ্রেণীর প্রধান বৃত্তি। পরে নাগরিক প্রয়োজনের তাগিদে এই শ্রেণী সাধারণ প্রশাসন, আইন-আদালত ইত্যাদি ক্ষেত্রেও দক্ষতা অর্জন করল। সম্ভবত, প্রথম দিকে বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের উপর সামন্ত প্রভুদের কিছু প্রভাব ছিল। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি বুর্জোয়া শ্রেণী নিজেদের জন্য স্বাধীন পরিবেশ তৈরি করতে পেরেছিল। অবশ্য এই শ্রেণীর মধ্যেও অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল, সবাই ধনী ছিল না। ধনী বুর্জোয়া গোষ্ঠীর সঙ্গে বহির্বাণিজ্যের যোগ ছিল। সামাজিক মর্যাদা বাড়াবার জন্য ধনী বুর্জোয়া অনেক সময় স্থানীয় চার্চের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখত। বিখ্যাত সাধু ফ্রান্সিস বণিকের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। নতুন ধনীরা অনেক ক্ষেত্রে সামন্ত শ্রেণীর সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে আভিজাত্য অর্জন করতে চাইত।

অপর নাগরিক শ্রেণী কারিগর ও মজুরদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তাদের অবস্থা বুর্জোয়াদের চেয়ে খারাপ ছিল, তবে সামন্ত প্রথায় প্রজা ও ভূমিদাসের তুলনায় তারা স্বচ্ছল ছিল। নাগরিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থেকে তারা একেবারে বঞ্চিত ছিল না। এই কারণেই তাদের গ্রাম থেকে শহরে চলে আসবার একটা প্রবণতা ছিল। দক্ষ কারিগরদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল।

শহরগুলির গুরুত্ব ও অবদান

শহরগুলি পরবর্তী কালের রাজাদের বেশি ক্ষমতা লাভে সাহায্য করেছিল। ধনী বণিক শ্রেণীর উত্থানের ফলে সামন্তদের প্রাধান্য কমে গেল। সামন্তদের দমন করবার প্রয়োজন হলে বণিকদের কাছ থেকে রাজারা অর্থ সাহায্য পেতেন। এই সাহায্যের দ্বারা রাজারা নিজেদের সৈন্যদল গড়ে তুললেন এবং সামন্তদের উপর নির্ভরশীল হবার প্রয়োজন শেষ হল। অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তিতে পুষ্ট হয়ে রাজা সামন্তদের ক্ষমতা অনেকাংশে খর্ব করলেন। ফ্রান্সে ক্যাপেসিয়ান

রাজারা সামন্তদের বিরুদ্ধে শহরগুলির সমর্থন পেয়েছিলেন। অবশ্য জার্মানী ও ইটালীতে শহরগুলির উত্থান স্থানীয় রাজশক্তিকে খর্ব করেছিল। জার্মান সম্রাটরা শহরগুলিকে বশে আনতে পারেন নি। এমন কি, তাঁরা শহরগুলির বিরুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন। অর্থ, সংগঠন, উৎসাহ ও সামরিক শক্তি—সকল ক্ষেত্রেই শহরগুলি মধ্যযুগের সমাজে নতুন ধারা এনেছিল। ফলে ক্ষয়িষ্ণু সামন্তপ্রথা আরও দুর্বল হল এবং গতানুগতিক কৃষি-অর্থনীতির পাশে নতুন এবং কর্মচঞ্চল বাণিজ্যভিত্তিক অর্থনীতি চালু হল। নাগরিক সমাজ প্রগতির সম্ভাবনা নিয়ে এসেছিল। যদিও শহরে শ্রেণীবৈষম্য ছিল এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল, তা হলেও নাগরিক সমাজ ও অর্থনীতিতে সুযোগের পরিমাণ অনেক বেশি ছিল। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সাংস্কৃতিক উন্নতির কারণ হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়-আন্দোলন ও দ্বাদশ শতাব্দীর সাংস্কৃতিক নবজাগরণে শহরগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। সব দিক দিয়ে দেখতে গেলে মধ্যযুগের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে শহরগুলির অবদান স্বীকার করতে হবে।

দশম অধ্যায়

মধ্যযুগে চীন

তাঙ বংশের রাজত্ব (৬১৮-৯০৭ খ্রীস্টাব্দ)

খ্রীস্টীয় সপ্তম শতকে চীনে তাঙ বংশের রাজত্ব শুরু হয়েছিল। তাঙ রাজত্বের অব্যবহিত আগে চীনে অরাজকতা দেখা দিয়েছিল। দেশটি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। তাঙ রাজাদের সুশাসনে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরে এল, রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপিত হল এবং দেশ শক্তিশালী হল। এর ফলে,সভ্যতার সামগ্রিক বিকাশ সম্ভব হয়েছিল।

তাঙ বংশের প্রতিষ্ঠাতা লি-উয়ান সিংহাসন অধিকার করে দেশের অরাজকতা দৃঢ় হস্তে দমন করলেন। চীনদেশের বহু অঞ্চল জয় করে তিনি দেশে একতা আনতে অনেকটা সফল হলেন। তাঁর কার্য

সমাপ্ত করলেন তাঁর যোগ্য পুত্র লি-শি-মিয়েন বা তাই স্যুঙ। তাই স্যুঙকে তাঙ বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা বলে মনে করা হয়। তিনি নিজের বাহুবলে এক বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। তুর্কীদের পরাজিত করে তিনি বর্তমান মঙ্গোলিয়া জয় করেন। খিতান বা পূর্ব মঙ্গোলিয়া এবং দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়াও তাঁর রাজ্যভুক্ত হয়। ট্রান্স-অক্সিয়ানা অঞ্চল তাঁর অধীনে আসে। এ ছাড়া, কাশগড়, ইয়ারখন্দ, সমরখন্দ ও বোখারা চীনের আধিপত্য মেনে নিল। এইভাবে মধ্যএশিয়ার বিখ্যাত স্থলবাণিজ্য অঞ্চলগুলি চীনের আয়ত্ত হল। তাই স্যুঙ দক্ষিণে আসাম থেকে পশ্চিমে কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিকারী হলেন। তাঁর পুত্র কাওস্যু কোরিয়াকে চীনের অন্তর্ভুক্ত করতে সমর্থ হন। এই বংশের অন্যতম প্রসিদ্ধ রাজা হুয়ান স্যুঙ বা মিঙ-হুয়াঙ-এর রাজত্বকাল সাহিত্য ও সভ্যতার অগ্রগতির জন্য বিখ্যাত। কিন্তু মিঙ-হুয়াঙ-এর রাজত্বের শেষভাগে আন-লু-শান নামে এক পদস্থ রাজকর্মচারী বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। যদিও এই বিদ্রোহ দমন করা হয়, তথাপি এরপরই তাঙ সাম্রাজ্য দ্রুতগতিতে অবনতির দিকে এগিয়ে যেতে শুরু করে।

তাঙ যুগে চীনের অগ্রগতি

তাঙ রাজত্বকালে চীনের সার্বিক উন্নতি হয়েছিল। অষ্টম খ্রীস্টাব্দে রাজধানী চাং আনের জনসংখ্যা ছিল প্রায় দশ লক্ষ। ৭৫৪ খ্রীস্টাব্দের জনগণনা অনুযায়ী চীনে পাঁচ কোটিরও বেশী লোক ছিল। প্রশাসনের ফলে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করত। রাজপুরুষেরা দেশ শাসন করতেন। তবে চাকুরী পাবার পুর্বে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় তাদের সাফল্য অর্জন করতে হত। চাং আন বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরীপ্রার্থী আমলাদের কনফুশিয়াসের দর্শন সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হত। তাই স্যুঙ ন্যায়বিচারের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তাঁর নির্দেশ অনুসারে দেশের আইনকানুন সুসংবদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। দেশে খাদ্যের অভাব ছিল না। তাই স্যুঙ কৃষকদের স্বার্থরক্ষার জন্য সচেষ্ট ছিলেন। ব্যবসা-বাণিজ্যের খুব প্রসার ছিল। বণিকদের জাহাজ জিনিস বেচাকেনার জন্য ভারত মহাসাগরে ও পারস্য উপসাগরে যেত। আরব ও পারসিক বণিকরা সমৃদ্ধ ক্যান্টন বন্দরে

আসত। চীন থেকে বিদেশীরা প্রধানত রেশম কিনত। তবে হাতির দাঁতের জিনিস, কচ্ছপের খোলা বা গণ্ডারের শিং দিয়ে তৈরী নানা দ্রব্যসম্ভারেরও চাহিদা ছিল। এই সময়ে চীনে প্রথম রূপার মুদ্রা চালু হয়। অর্থনৈতিক অগ্রগতি এত বেশী হয়েছিল যে, সারা দেশে প্রায় একশটি টাকশাল স্থাপনের প্রয়োজন হয়েছিল। কখনও নগদ টাকায় এবং কখনও জিনিসের মাধ্যমে কর দিতে হত। রাস্তা-নির্মাণ প্রভৃতি জনহিতকর কাজের জন্য নাগরিকদের শ্রমদান করতে হত। জলপথে দূর অঞ্চল থেকে শস্য নিয়ে আসতে হত। চাং-আন অঞ্চলে জলসেচের ব্যবস্থা ছিল।

তাঙ যুগে বৌদ্ধধর্ম বিশেষ প্রসার লাভ করেছিল। বহু বৌদ্ধ মঠ, বিহার, স্তূপ ও মন্দির এই সময়ে তৈরী হয়েছিল। বৌদ্ধরা চিকিৎসালয়, সরাইখানা প্রভৃতি নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। কনফুশিয়াসের মতবাদ ও লাও-ৎসের প্রচারিত তাও ধর্মও যথেষ্ট বিস্তারলাভ করেছিল। দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা ও শাসনকার্য কনফুশিয়াসের নিয়মাবলী অনুসারে পরিচালিত হত। তাও ধর্মে মূর্তিপূজা নেই। ঈশ্বর সম্বন্ধে এই ধর্ম নীরব। দয়া, অহিংসা প্রভৃতি তাও ধর্মের অঙ্গ। এই সময়ে চীনে নানা দেশের নানা ধর্মের লোক আসতেন। মুসলমান, খ্রীস্টান ও জরথুস্ত্রীয়রা চীনে ধর্ম প্রচার করতেন। মহম্মদ তাই স্যুঙ-এর কাছে ধর্মদূত পাঠিয়েছিলেন ও তাঁর অনুমতিক্রমে ক্যাণ্টন শহরে একটি মসজিদ তৈরী হয়েছিল। চীনে একটি খ্রীস্টান গীর্জাও তৈরী হয়েছিল ও একুশ জন খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। আরব মুসলমানদের আক্রমণের ফলে পারসিকরা সাহায্যের আশায় এখানে এসেছিলেন। কিন্তু চীনে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাবই বেশী ছিল বলে ভারতের সঙ্গে চীনের ভাবের আদান-প্রদান ছিল বেশী। হিউ-এন সাঙ নামে এক বৌদ্ধ ভিক্ষু তাঙ যুগে বৌদ্ধ দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে ভারতে এসেছিলেন। হিউ-এন সাঙ মধ্য এশিয়ায় তাসখন্দ ও সমরখন্দের পথে ভারতে এসেছিলেন। তিনি অনেক দিন (৬৩০-৪৪ খ্রীস্টাব্দ) ভারতে ছিলেন। তখনকার ভারতের সমাজ, ধর্ম, সংস্কৃতি ও অথনীতি সম্পর্কে তিনি অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর প্রভাবে ভারত ও চীনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। ৬৪১ খ্রীস্টাব্দে

উত্তর ভারতের রাজা হর্ষবর্ধন চীন-সম্রাটের কাছে ব্রাহ্মণ দূত পাঠিয়েছিলেন। কিছুদিন পরে চীন থেকে একটি সাংস্কৃতিক দল তাঁর রাজসভায় উপস্থিত হয়েছিল। হিউ-এন সাঙ নিজে বহু বৌদ্ধধর্ম-সম্বন্ধীয় বই দেশে নিয়ে গিয়েছিলেন। আবার ভারতবর্ষ থেকে প্রভাকরগুপ্ত, অভিগুপ্ত, বুদ্ধপাল, অমোঘবর্ষ প্রভৃতি বৌদ্ধ সন্ন্যাসী চীনে এসেছিলেন। তাঁরা বহু বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন।

তাঙ যুগের উদার সভ্যতা প্রতিবেশী রাজ্যগুলির উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। জাপান বিশেষ ভাবে চীন-সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। চীন থেকে বৌদ্ধধর্ম কোরিয়া ও জাপানে বিস্তার লাভ করে। জাপানের তাঁত বয়ন ও রেশম শিল্প চীন থেকে শেখা। উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য জাপানী ছাত্ররা চীনে আসতেন। তবে জাপানীরা চীনের অন্ধ অনুকরণ করেন নি; তাঁরা নিজেদের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছিলেন। বর্তমান ভিয়েৎনাম এবং কোরিয়াও চীন-সভ্যতার কাছে ঋণী। তিব্বতের রাজা স্রং সাঙ গ্যাম্‌পো তাঁর চীনা ও নেপালী মহিষীদের প্রভাবে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন ও তিব্বতে ঐ ধর্ম প্রচার করেন। চীনের কাছ থেকে কাগজ তৈরীর পদ্ধতি আরবরা শিখেছিলেন।

তাঙ যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্পকলা, সাহিত্য ও শিক্ষার যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছিল। এই সময়ে মুদ্রণ যন্ত্র প্রচলিত হয়েছিল। এই সময়ে বারুদ আবিষ্কৃত হয় ও কাগজের টাকা প্রচলিত হয়। রেশম এবং গাছের ছাল দিয়ে কাগজ প্রস্তুত হত। প্রাচীন কাল থেকেই চীনে মুদ্রণ পদ্ধতিতে পরীক্ষা চলছিল। এ বিষয়ে বৌদ্ধমঠগুলির উল্লেখ-যোগ্য অবদান ছিল। পরবর্তী সুঙ যুগে মুদ্রণ শিল্প আরও উন্নত হয়েছিল। তাঙ যুগে উৎসব-অনুষ্ঠানে বারুদের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। সুঙ যুগে সামরিক ক্ষেত্রে বারুদের ব্যবহার শুরু হয়। চতুর্থ খ্রীস্টাব্দ থেকে চা পানীয় হিসাবে জনপ্রিয় হয়েছিল। হান-লিন বিদ্যালয়ে আমলাদের শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। তাই সুঙ সাহিত্য-চর্চার জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। সেখানে বিখ্যাত পণ্ডিতদের নিযুক্ত করা হত এবং বড় গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছিল। সম্রাট নিজেও অবসর সময়ে সাহিত্য-চর্চার জন্য এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে যেতেন। কাব্য-চর্চার

উৎকর্ষের জন্য তাঙ যুগ বিখ্যাত। লিপো ছিলেন এযুগের সর্বাপেক্ষা যশস্বী কবি। তাঁর কাব্যমাধুর্যের জন্য তাঁকে নির্বাসিত দেবদূত আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। সঙ্গীত চর্চার জন্য এক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। গুহা স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যও উন্নত ছিল। তাই স্যুঙ-এর সমাধি-মন্দিরের খোদাই করা ঘোড়া সম্রাজ্ঞী হু'র মাতার সমাধির সিংহমূর্তি তাঙ ভাস্করদের অমর কীর্তি। বোধিসত্ত্বের মূর্তিগুলিও আগেকার মূর্তির মত নিষ্প্রাণ ছিল না। এইসব মূর্তিতে করুণার ছাপ ফুটে উঠেছে। উ-তাও-ৎসে এই যুগের প্রসিদ্ধ চিত্রকর। তাঁর শিল্পরীতি এখনও চীন ও জাপানের ছবিকে প্রভাবিত করে। প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী আর ধর্ম সম্বন্ধীয় ছবিই বেশী আঁকা হত। শিল্পী হান কানের আঁকা ঘোড়ার ছবি সজীবতার জন্য খ্যাতিলাভ করেছে। এই যুগে চীনামাটির পাত্র তৈরীর ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। পালিশের কাজেও শিল্পীরা সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

তাঙ যুগকে প্রকৃতই চীনের স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করা যায়। ৬১৮ থেকে ৯০৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় তিনশ বৎসর রাজত্ব করবার পর তাঙ সাম্রাজ্যের পতন হয়। উত্তর চীনে পাঁচটি ও দক্ষিণে দশটি রাজ্যের অভ্যুত্থান হয়েছিল। এই সময়কে দশ-রাজ্য ও পাঁচ-বংশের যুগ বলে অভিহিত করা হয়।

স্যুঙ বংশের ইতিহাস

স্যুঙ বংশের আমলে (৯৬০-১২৮০ খ্রীস্টাব্দে) চীনের পূর্বগৌরব অনেকটা ফিরে এসেছিল। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন চাও-কুয়াঙ নামে অভিজাত বংশীয় সেনাপতি। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাই-স্যুঙ এই বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট। স্যুঙ সম্রাটরা চীনের স্বাধীন রাজ্যগুলি জয় করে দেশের রাজনৈতিক একতা ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে খিতান নামে এক দুর্ধর্ষ জাতির আক্রমণে স্যুঙ সম্রাটরা বিপর্যস্ত হয়ে গেলেন। অবশেষে তাঁরা জুকেন নামে আরেকটি শক্তির সাহায্যে খিতানদের পরাজিত করলেন। কিন্তু এরপর জুকেন জাতিই চীনের উপর আক্রমণ শুরু করল। জুকেনরা উত্তর চীন দখল করে সেখানে 'কিন' রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করল। তাঁদের রাজধানী ছিল পিকিং। স্যুঙ শাসন দক্ষিণ

চীনে সীমাবদ্ধ রইল। এখন থেকে সুঙ রাজাদের দক্ষিণ সুঙ বংশভুক্ত বলে অভিহিত করা হত। তাঁদের নতুন রাজধানী ছিল হান চাও। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য হান চাও বিখ্যাত ছিল। সুঙ সম্রাটরা খুব বেশী সামরিক কৃতিত্ব দেখাতে সক্ষম হন নি। তবে জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প বা সাহিত্যে চীন পিছিয়ে ছিল না। সুঙ রাজারা দেশে আবার আমলাতন্ত্র প্রবর্তন করলেন। আগের মতই আমলাদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চাকুরীতে ঢুকতে হত। পরীক্ষার মান আরও উঁচু করা হল। চিকিৎসাবিদ্যা, সামরিক বিদ্যা প্রভৃতি শেখার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হল। সুঙ রাজারা খুব বিদ্যোৎসাহী ছিলেন।

সুঙ যুগে বিভিন্ন জনহিতকর কাজ

সুঙ আমলের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ওয়াঙ-আন-সি কর্তৃক শাসন-ব্যবস্থার সংস্কার সাধন। ওয়াঙ-আন-সি ছিলেন সুঙ সম্রাট সেন-তুঙের মন্ত্রী। তিনি একাধারে রাজনীতিবিদ ও দার্শনিক ছিলেন। দেশের প্রতিটি লোক যাতে জীবন-ধারণের প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি পায় সেই ব্যবস্থা করা ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। তিনি দরিদ্র জনসাধারণের স্বার্থরক্ষার জন্য কয়েকটি ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-পরিচালনার ভার একটি পরিষদের হাতে দেওয়া হল। এই পরিষদ ধনীদের শোষণের হাত থেকে গরীব-দের রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়েছিল। পরিষদের সদস্যরা দেশের চাষীদের নামমাত্র সুদে ঋণ দিতেন। চাষীদের সুবিধার জন্য তাঁরা দেশের শস্য বণ্টনের ভারও সরকারের হাতে দেবার ব্যবস্থা করলেন। একটি অঞ্চলের উৎপন্ন শস্য আগে সেই অঞ্চলের লোকদের প্রয়োজন মেটাতে ব্যয় হত। চাষীরা খাদ্যশস্যই রাজস্ব হিসাবে দিত। উদ্বৃত্ত শস্যের বণ্টনব্যবস্থা সরকারের হাতে ছিল। এই ব্যবস্থায় শস্যের দাম নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হত এবং কৃষকেরা ঠিক দাম পেত। জমির উর্বরতা অনুযায়ী জমির রাজস্ব ঠিক করা হত। এ ছাড়া, ওয়াং আনের প্রধান কৃতিত্ব ছিল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির উপর কর ধার্য করা। আগে দরিদ্রদেরই বেশী কর দিতে হত। ধনীরা অপেক্ষাকৃত কম খাজনা দিত। তিনি এই অবিচার দূর করলেন। চাষীদের উপর রাজস্বের বোঝা কমে গেল। আইন করে বেগার খাটুনী বন্ধ করা হল।

প্রত্যেককে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেবার ব্যবস্থা হল। রাজ্যের আয় ও ব্যয়ের হিসাব রাখবার জন্য একটি পরিষদ গঠিত হল।

বহিঃশত্রুর হাত থেকে চীনকে রক্ষা করবার জন্য ওয়াং-আন-সি সচেষ্ট ছিলেন। যে-সব পরিবারে একজনের বেশী পুরুষ ছিল সে-সব পরিবারের দুজন পুরুষকে সৈন্যবাহিনীতে অথবা দেশের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিসের দলে যোগ দিতে বাধ্য করা হত। এইভাবে তিনি পাও-চিয়া নামে একটি রক্ষী বাহিনী গঠন করেন। এ ছাড়া, প্রতিটি পরিবারকে একটি ঘোড়া রাখতে হত। প্রয়োজন হলে যাতে সেটিকে যুদ্ধে ব্যবহার করা যায়। দরিদ্র পরিবারগুলিকে রাষ্ট্রই ঘোড়া কিনে দিত, তবে রক্ষণাবেক্ষণ পরিবারের লোকদের করতে হত। এ ছাড়া, সরকারী চাকুরীয়াদের পরীক্ষার পদ্ধতিও বদলানো হল। তাঁদের বাস্তব বুদ্ধির পরীক্ষার দিকে জোর দেওয়া হল। দুর্ভাগ্যবশত ওয়াং-আন-সির সংস্কার দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। তাঁর অনেক প্রবল শত্রু ছিল। তা ছাড়া, সরকারী কর্মচারীদের অসাধুতাও তাঁর ব্যর্থতার অন্যতম কারণ।

সুঙ যুগে সভ্যতা ও সংস্কৃতি

এই সময়ে চীনের প্রাচীন ইতিহাস ও সভ্যতার উপর বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। এই সময় জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা ও গণিতশাস্ত্রের বিশেষ চর্চা হত। বহু যশস্বী কবি সঙ্গীতকার এ যুগের কাব্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। কথ্য-ভাষায় গল্প রচনাও শুরু হয়েছিল। শিল্পকলার উন্নতি হয়েছিল। চীনামাটির বা পোর্সিলেনের নানা আকারের নক্শাকাটা পাত্র এ যুগের একটি বিশিষ্ট শিল্প। দক্ষিণ চীনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য চিত্রকরদের ছবিতে রূপ পেয়েছিল। চিত্র-শিল্পে বোধিসত্ত্বের ছবি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করছে। কু-চুং-সু এই আমলের বিখ্যাত শিল্পী। সুঙ যুগে চীনে প্রথম স্থায়ী নৌবহর গঠিত হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার হয়। আরব ও ইহুদীরা চীনে বাণিজ্য করতে আসত। জাপানের সঙ্গেও বাণিজ্য বেড়ে যায়। জাপানের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা চীনে ধর্মসম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে যেতেন। এঁদের অনেকে চীনের বৌদ্ধমঠে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হতেন। কনফুসি-য়াসের মতবাদের যথেষ্ট প্রসার হয়েছিল। ভিয়েৎনাম, জাভা ও সুমাত্রা

থেকে দূতরা চীনের রাজসভায় আসতেন। বাণিজ্যের প্রসারের ফলে শহরের সংখ্যা বেড়ে গেল। ১২১৪ খ্রীস্টাব্দে চীনের জনসংখ্যা ছিল প্রায় দশ কোটি। বণিকরা এত ধনী হলেন যে, তাঁদের প্রতিপত্তি বেড়ে গেল। তামার মুদ্রার প্রচলন হয়েছিল। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সাংস্কৃতিক বিকাশকে সাহায্য করেছিল। কিন্তু মোঙ্গল আক্রমণ স্বুং যুগের পতনের সূচনা করেছিল। মোঙ্গলরা উত্তর চীন জয় করল এবং ১২১৫ খ্রীস্টাব্দে পিকিং অধিকার করল। ক্ষয়িষ্ণু স্বুঙ রাজ্য ১২৭৯-৮০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত টিকে ছিল।

মোঙ্গল আধিপত্য

দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে চীনের উত্তরে বৈকাল হ্রদের তীরে দুর্ধর্ষ ও হিংস্র মোঙ্গল জাতির বাস ছিল। তেমুচীন নামে এক দলপতি মোঙ্গলদের বিভিন্ন উপজাতিকে সংঘবদ্ধ করে একটি শক্তিশালী জাতি তৈরী করেছিলেন। এই নিষ্ঠুর ও রণকুশলী সেনাপতি মঙ্গোলিয়া জয় করে চেঙ্গিস খান বা বিশ্বসম্রাট (রাজত্বকাল ১২০৬-২৭ খ্রীস্টাব্দ) উপাধি গ্রহণ করেন। চেঙ্গিস খান উত্তর চীনে কিন রাজ্য জয় করেন। পরে তিনি অক্ষু নদীর অববাহিকা, কাশগড়, খোকন্দ, পারস্য, বোখরা এবং সমরখন্দ জয় করেন। রাশিয়ার কিয়েভের গ্রাণ্ড ডিউকও তাঁর কাছে পরাজিত হলেন। তারপর তিনি কৃষ্ণসাগরের উত্তর কূল পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলেন, তবে কনস্টান্টিনোপল আক্রমণ না করেই তিনি পূর্বদিকের এক বিদ্রোহ দমন করতে ফিরে এলেন। চেঙ্গিস খান নারী, পুরুষ, বৃদ্ধ, শিশু নির্বিশেষে হত্যা করেছেন। প্রাসাদ, মসজিদ, গ্রন্থাগার সবই তিনি ধ্বংস করেছেন। তাঁর নিষ্ঠুরতায় সভ্যতার অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু তিনি বিচক্ষণ শাসক ছিলেন। তিনি কবিতা রচনা করতেন। নিরক্ষর হলেও তিনি বিদ্যানুরাগী ছিলেন। তাঁর আমলে মোঙ্গলরা মুসলমান ছিল না। চেঙ্গিসের ধর্মমত উদার ছিল। তাঁর রাজত্বে সকলেই স্বাধীনভাবে ধর্মচর্চা করতে পারত। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ওগতাই এই সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হলেন। তাঁর নেতৃত্বে মোঙ্গলরা মস্কো, কিয়েভ, পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরী ধ্বংস করেছিল। ওগতাই কিন রাজ্য ও সেচুয়ান দখল করেন। ওগতাই-এর মৃত্যুর পর তাঁর

উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। ১২৫১ খ্রীস্টাব্দে মঙ্গু খান প্রধান খান পদে আসীন হলেন। তাঁর ভাই কুবলাই-এর সহযোগিতায় তিনি চীন আক্রমণ করলেন। পাঁচ বৎসর অবরোধের পর চীন তাঁর দখলে আসে। কুবলাই খান চীন দেশের প্রধান শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত হলেন। ক্রমশ সমস্ত চীন মোঙ্গলদের অধিকারে এল। মঙ্গু খানের অপর এক ভাই হুলাগু বাগদাদ আক্রমণ করে এই শহরের শিল্প-সম্পদ ধ্বংস করেন ও খলিফাকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করেন। মঙ্গু খানের মৃত্যুর পর কুবলাই খান প্রধান খানের পদ লাভ করলেন। তিনি প্রধানত চীন শাসন করতেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বংশকে ইউয়ান বংশ (১২৮০-১৩৬৮ খ্রীস্টাব্দ) বলা হয়। চীনের পিকিং শহরে তাঁর রাজধানী স্থাপিত হল। কুবলাই তিব্বত ও দক্ষিণ চীনের উপর মোঙ্গল আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই সময়ে মোঙ্গল রাজ্য দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেল। পশ্চিমে শাসন করতেন হুলাগু খান আর পূর্বে আধিপত্য করতেন কুবলাই খান। ১২৫৯ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১২৯৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কুবলাই চীন শাসন করেছিলেন।

কুবলাই খান

কুবলাই প্রজাহিতৈষী শাসক ছিলেন। তাঁর নির্দেশে কর্মচারীরা ঘুরে ঘুরে প্রজাদের অবস্থার খোঁজ নিতেন। রাজার শস্যাগারে দু'বৎসরের জন্য খাদ্যশস্য জমা রাখা হত। রাজা বৃদ্ধ, অনাথ, দুঃস্থ ও পণ্ডিতদের সাহায্য করতেন। কুবলাই খান বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। এই যুগে বহু নাটক ও উপন্যাস রচিত হয়। চিকিৎসাবিজ্ঞান ও গণিতশাস্ত্র উন্নত হয়। কুবলাই খান চীনদেশের প্রাচীন সংস্কৃতির অনুরাগী ছিলেন। এই যুগে মধ্যএশিয়াতে চীন-সভ্যতার প্রবেশ ও বিস্তার ঘটে। কুবলাই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন, তবে তিনি তিব্বতী বৌদ্ধধর্ম অনুসরণ করতেন। তিব্বত জয়ের পর কুবলাই তিব্বতী ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তিব্বতের বৌদ্ধধর্ম ও মঠ সন্ন্যাসীকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হত। তা ছাড়া, তিব্বতে অনেক রকমের তন্ত্র প্রচলিত ছিল। ভৌগোলিক দিক থেকে দুর্গম হওয়ায় তিব্বত বৌদ্ধধর্মের স্থানীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে পেরেছিল। ধর্মের

ক্ষেত্রে কুবলাই অত্যন্ত উদার ছিলেন। তাও, খ্রীস্টান ও মুসলমানদের তিনি সমান শ্রদ্ধা করতেন। এইসব ধর্মাবলম্বী পুরোহিতদের কর দিতে হত না। তাঁর সময়ে বিভিন্ন শিল্পের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। চশমার আবিষ্কার ইউয়ান যুগেই হয়। এ যুগের চিত্রকলা ও মৃৎপাত্রের গড়নে পারসিক প্রভাব লক্ষ করা যায়। মোঙ্গল-দের আড়ম্বরপ্রিয়তার ছাপ ইউয়ান যুগের রাজদরবারে ও শিল্পকলার মধ্যে পাওয়া যায়। কুবলাই-এর প্রাসাদ জাঁকজমকের জন্য বিখ্যাত ছিল।

কুবলাই খান

কুবলাই-এর মৃত্যুর পর ইউয়ান বংশের শাসন চলতে লাগল, তবে মোঙ্গল সাম্রাজ্য বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। মোঙ্গলদের বর্বর সম্বোধনে ভূষিত করলে ভুল করা হবে। তাঁরা চীনের প্রাচীন সংস্কৃতি গ্রহণ করেছিলেন। প্রশাসন, বাণিজ্য, কৃষি এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁদের যথেষ্ট অবদান ছিল। তাঁদের প্রচেষ্টায় এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক প্রসারিত হয়েছিল। এই সময়ে ভারত ও পারস্যের সঙ্গে চীনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ভারতের 'বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা চীনে আসতেন।

মার্কোপোলো ও কুবলাই খান

ভেনিস থেকে মার্কোপোলো নামে একজন পর্যটক কুবলাই খানের রাজত্বকালে চীন পরিভ্রমণে আসেন। তৎকালীন চীন ও কুবলাই খানের সম্বন্ধে তাঁর বিবরণী থেকে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। ১২৯৮ খ্রীস্টাব্দে ভেনিস ও জেনোয়া শহরের মধ্যে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মার্কোপোলো শত্রুর হাতে বন্দী হন। সময় কাটাবার জন্য তিনি রাস্টিসিয়ানো নামে এক কারাসঙ্গীকে তাঁর ভ্রমণের গল্প বলতেন। রাস্টিসিয়ানো সেগুলি লিখে রাখেন ও পরে মার্কোপোলোর ভ্রমণ-

কাহিনী নামে তা প্রকাশিত হয়। এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত আমাদের কাছে তথ্যবহুল এবং আকর্ষণীয়। পামির, কাশগড়, ইয়ারখন্দ, কারাকোরামের রাস্তা এবং পিকিং-এর রাজপ্রাসাদ সম্পর্কে বহু তথ্য এই বইতে আছে।

মার্কোপোলোর পিতা ও কাকা নিকালো পোলো ও মাফিও পোলো ভেনিসের বণিক ছিলেন। ব্যবসা-সংক্রান্ত কাজে তাঁরা বোখারায় যান। সেখানে কুবলাই খানের দূতের সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়। তাঁর অনুরোধে সাড়ে তিন বৎসর পথ চলে তাঁরা চীনের রাজধানীতে আসেন। কুবলাই আগ্রহ সহকারে তাঁদের অভ্যর্থনা করলেন। খ্রীস্টধর্ম সম্বন্ধে নানা কথা শুনে কুবলাই মোঙ্গলদের মধ্যে খ্রীস্টধর্ম প্রচারে মনস্থ করলেন। তিনি একশ জন খ্রীস্টান পণ্ডিতকে তাঁর রাজ্যে আনতে চাইলেন। পোলো ভ্রাতৃদ্বয় সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে পোপের সঙ্গে দেখা করলেন ; কিন্তু খ্রীস্টান পণ্ডিতরা এই দুর্গম ও দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে ইচ্ছুক না হওয়ায় তাঁরা মাত্র দু'জন খ্রীস্টান প্রচারককে নিয়ে চীন অভিমুখে যাত্রা করলেন। সতের বৎসরের কিশোর মার্কোপোলো তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। বহু বিপদের মধ্যে দিয়ে গোবি মরুভূমি অতিক্রম করে তাঁরা চীনে গিয়েছিলেন (১২৭৫ খ্রীস্টাব্দ)। পথে মার্কোপোলো মোঙ্গল ভাষা শিখলেন। পরে তিনি কুবলাই-এর প্রিয়পাত্র হলেন। কুবলাই মার্কোপোলোকে হ্যাংচার শহরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন। মার্কোপোলো কুবলাই-এর দরবারের আড়ম্বরের বিবরণ দিয়েছেন। হ্যাংচাও শহর বাঁধানো রাস্তা, সেতু, বাজার ও দোকানে সুসজ্জিত ছিল। ভারতের সঙ্গে নিয়মিত ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। বস্ত্রশিল্পে রেশম ও জরির কাজ করা ব্রোকেডের কাপড় ছিল প্রধান আকর্ষণ। পিকিং শহরের বাজার নানাদেশের পণ্যসম্ভারে পূর্ণ ছিল। বড় বড় শহরে ভাল সরাইখানা ও গরম জলের স্নানাগার ছিল। দেশের নানা জায়গায় আঙুর ক্ষেত এবং নানারকমের গাছের বাগান ছিল। সারা দেশে অনেক বৌদ্ধ মঠ ছিল।

যোল বৎসর পর পোলোদের দেশে ফিরবার ইচ্ছা হল। অবশ্য তাঁদের ছেড়ে দিতে কুবলাই মোটেই ইচ্ছুক ছিলেন না। এই সময়ে পারস্যের রাজা আরগনের সঙ্গে বিবাহের জন্য এক মোঙ্গল রাজ-

কুমারীকে পারস্যে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হল। কুবলাই পথ-প্রদর্শক হিসাবে পোলোদের পাঠালেন। পোলোরা জলপথে সুমাত্রা ও দক্ষিণ ভারত ঘুরে গিয়েছিলেন। মার্কোপোলো ব্রহ্মদেশের হস্তিবাহিনী ও তাদের মোঙ্গল তীরন্দাজদের কাছে পরাজিত হবার
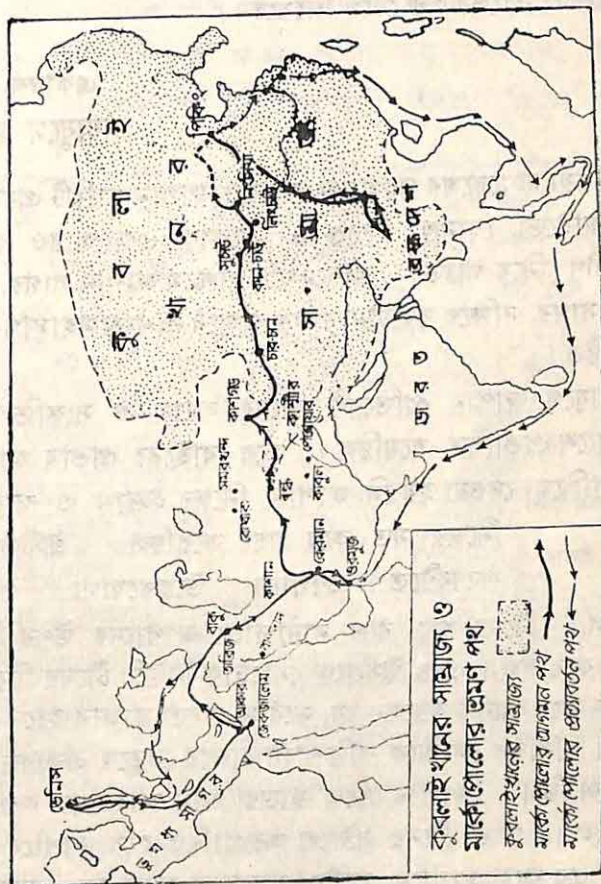
বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি জাপানের সোনা ও সম্পদের কথা লিখেছেন। তাঁর বিবরণীতে দাক্ষিণাত্যের এক শক্তিশালী রানী ও ভারতীয় যোগীদের কথা আছে। পারস্য থেকে তাঁরা কনস্টান্টিনোপলে এলেন। দীর্ঘদিন পরে তাতার-বেশী পোলোদের প্রথমে কেউ চিনতে পারেন নি। তাঁরা একটি ভোজসভায় বন্ধু ও পরিজনদের ডাকলেন। পরে তাঁরা নিজেদের জামার কাপড় কেটে সেখান

থেকে প্রচুর দামী পাথর বের করলেন। এবার সকলেই তাঁদের চিনতে পারলেন। মার্কোপোলো ইউরোপীয় হলেও চীনকে আপন করে নিতে পেরেছিলেন। অনুসন্ধিৎসা এবং গভীর বিচারবুদ্ধির সঙ্গে মার্কোপোলো একটি অজানা দেশ সম্পর্কে অনেক তথ্য সংগ্রহ করে পরবর্তী কালের জন্য রেখে গিয়েছেন।

একাদশ অধ্যায়

মধ্যযুগে জাপান

এশিয়া মহাদেশের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত জাপান চারিটি প্রধান দ্বীপ —হোক্কাইডো, হোনশু, কিয়ুশু ও শিকোকু এবং আরও কয়েকটি ছোট দ্বীপ নিয়ে গঠিত। এই দেশটি পশ্চিমে জাপান সাগর, উত্তরে ওখটস্ক সাগর, দক্ষিণে পূর্ব চীন সাগর ও পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত।

মধ্যযুগে জাপান প্রতিবেশী চীনের সমাজ ও সংস্কৃতির দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত হয়েছিল। তবে বাইরের প্রভাব জাপানের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় নি, জাপান নিজের ইচ্ছায় ও স্বার্থে তা নিজের মত করে গ্রহণ করেছিল। খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে জাপানে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছিল। চীনের তাঙ বংশ নানাভাবে জাপানের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। ৬০৪ খ্রীস্টাব্দে সোটোকু টাইসি চীনের চিন্তাধারা অনুসরণ করে প্রচার করলেন যে, সর্বোচ্চ ক্ষমতা রাজার হাতে থাকা উচিত। বিভিন্ন গোষ্ঠীকে শক্তিশালী রাজার নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়োজন ছিল। জাপান থেকে ছাত্ররা জ্ঞান আহরণের জন্য চীনে গিয়েছিল। তারা চীনের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে জাপানে ফিরে এল। এর ফলে জাপানে তাইকা সংস্কারের সূচনা হয়। সমস্ত জমি ও শস্যের উপর রাজার অধিকার ঘোষিত হল, একটি স্থায়ী রাজধানী প্রতিষ্ঠার কথা বলা হল, কেন্দ্রীয় শাসনকে সুসংবদ্ধ করা হল এবং কর-আদায়ের ব্যবস্থার উন্নতি হল। এই সঙ্গে চাষীকে জমি বণ্টনের কথাও বলা হল।

চীনের প্রভাব

এইসব সংস্কার ক্ষমতাকে কেন্দ্রীভূত করেছিল। অবশ্য ভূমি-সংস্কারকে বাস্তব রূপ দেওয়া শক্ত ছিল, কারণ শক্তিশালী গোষ্ঠী

ও পরিবারগুলি—যারা জমি ভোগ করত—তারা এইসব সংস্কারের বিরোধিতা করেছিল। সংঘর্ষ এড়াবার জন্য জমিতে তাদের অধিকার, এই যুক্তিতে স্বীকৃত হল যে, তারা রাজার নামে এইসব জমি ভোগ করছে। এই সব শক্তিশালী অভিজাতদের বড় বড় সরকারী পদে নিযুক্ত করা হত এবং রাজদরবারে মর্যাদার আসন দেওয়া হত। কেন্দ্রীয় সরকার আঞ্চলিক প্রধানদের প্রাদেশিক শাসনকর্তা হিসাবে নিযুক্ত করত।

সংস্কারের বিরোধিতা

বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য প্রদেশ (আনুমানিক ৯০০ খ্রীষ্টাব্দ)
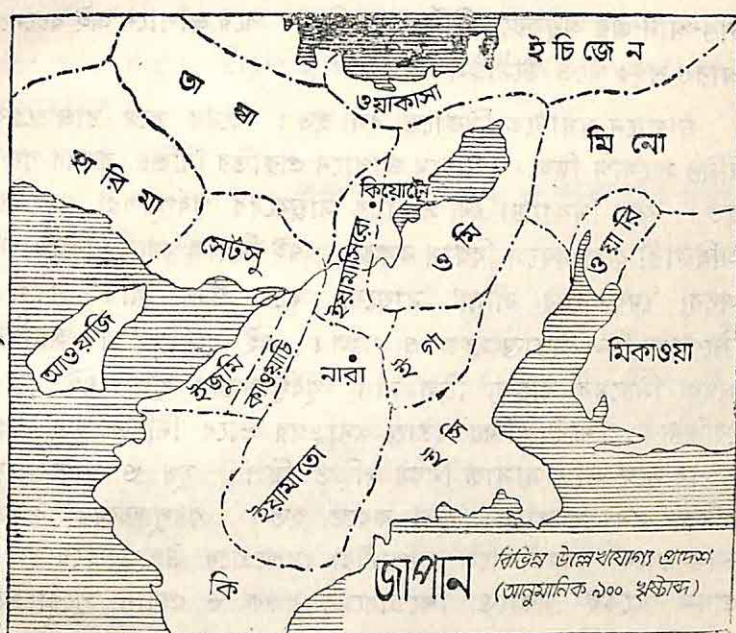
সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রাজার শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষিত হলেও সামন্তদের শক্তি ও ক্ষমতা সম্পূর্ণ খর্ব করা হয় নি। উজি নামধারী কায়েমী স্বার্থের একটি গোষ্ঠী প্রথমে পরিবর্তনের বিরোধিতা করলেও পরে এই গোষ্ঠী সম্রাট-দের অনুগত একটি অসামরিক অভিজাত শ্রেণীতে (কুজ) পরিণত হয়েছিল। প্রদেশগুলি থেকে সম্পদ সংগ্রহ করাই ছিল এইসব সংস্কারের প্রধান উদ্দেশ্য।

সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীর জাপানে চীনের সম্রাটের অনুকরণে

জাপানের রাজাকেও সম্রাটের ক্ষমতা ও মর্যাদায় ভূষিত করবার প্রচেষ্টা হয়েছিল। জাপানের রাজতন্ত্রের সংগঠন মোটামুটি সরল ছিল। রাজা কোনও একটি বিশেষ শহরে স্থায়ী ভাবে বাস করতেন না। তিনি যখন যে-শহরে বাস করতেন তখন সে শহর রাজধানী বলে গণ্য হত। সুতরাং রাজদরবারও ভ্রাম্যমাণ অবস্থায় থাকত। অষ্টম শতাব্দীতে চীনের প্রভাবে জাপানে প্রথম বড় শহর ও স্থায়ী রাজধানী নির্মিত হয়। নারা নামে এই শহর তাঙ চীনের রাজধানী চাঙ-আন-এর অনুকরণে নির্মিত হয়েছিল। পরে জাপানে এই ধরনের আরও শহর গড়ে উঠেছিল।

মিকাডো, শিন্টোধর্ম, বৌদ্ধধর্ম

জাপানে সম্রাটকে মিকাডো বলা হত। ধর্মের সঙ্গে রাজতন্ত্রের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। প্রথমে জাপানে প্রকৃতির বিভিন্ন রূপের পূজা হত। স্বয়ং মিকাডো এবং সাধারণ মানুষদের পূর্বপুরুষরা দেবত্বের অধিকারী বলে সকলে বিশ্বাস করত। এই বিশ্বাস থেকে শিন্টোধর্ম অথবা 'দেবতাদের লীলা' মানুষের মনে স্থান লাভ করল। শিন্টোধর্ম ছিল অত্যন্ত সহজ ও সরল। এই ধর্মে আচার-অনুষ্ঠান অথবা নিয়মের বাহুল্য ছিল না। পূর্বপুরুষদের পূজা এই ধর্মের বৈশিষ্ট্য। শিন্টো মন্দির অত্যন্ত অনাড়ম্বর ভাবে নির্মিত হত এবং পূজার সঙ্গে অতি সামান্য নিয়ম জড়িত ছিল। মুখ ও হাত ধুয়ে পবিত্র মনে দেবতাদের পূজা করতে হত। পূর্বপুরুষদের প্রতি ভক্তি থেকে পরবর্তীকালে জাপানীরা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। প্রথম থেকেই মিকাডো শিন্টোধর্মের রক্ষক ও প্রধান পুরোহিত ছিলেন। সুতরাং প্রশাসন এবং ধর্ম একই জায়গায় কেন্দ্রীভূত ছিল। পরবর্তী কালে যখন অন্যান্য ক্ষেত্রে সংস্কার প্রবর্তিত হল, তখনও ধর্মের উপর মিকাডোর নিয়ন্ত্রণ অক্ষুণ্ণ থাকল। এ ক্ষেত্রেও জাপান চীনের অনুকরণ করেছিল, কারণ চীনের সম্রাট একাধারে পার্থিব ও অধ্যাত্মিক জগতের সার্বভৌম ছিলেন। তা ছাড়া, মিকাডোর পক্ষে শিন্টোধর্মের প্রধান হওয়া স্বাভাবিক ছিল, কারণ জনসাধারণ বিশ্বাস করত যে, তিনি ঈশ্বরের প্রতিনিধি।

এই প্রসঙ্গে বৌদ্ধধর্মের উল্লেখ করা যেতে পারে। ৫৩৮ খ্রীস্টাব্দে মহাযান বৌদ্ধধর্ম কোরিয়া থেকে জাপানে এসেছিল। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে

সঙ্গে বৌদ্ধ সাহিত্য, শিল্প এবং সংস্কৃতিও জাপানে প্রভাব বিস্তার করে। শিণ্টোধর্মে বিশ্বাসী হয়েও অনেকে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিল। কনফুশিয়াসের মতবাদও চীন থেকে জাপানে প্রবেশ করে। ধর্মের ক্ষেত্রে না হলেও নীতিশিক্ষার ক্ষেত্রে কনফুশিয়াসের দর্শন জাপানকে প্রভাবিত করে। নারাতে রাজধানী স্থাপিত হলে বৌদ্ধধর্ম সরকারী আনুকূল্য লাভ করল। বৌদ্ধধর্মের মাধ্যমে চীনের সংস্কৃতি জাপানে প্রবেশ করে। বৌদ্ধধর্মের সুপরিচালিত সংগঠন ও অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা রাষ্ট্রের সামনে একটি শক্তিশালী কাঠামোর দৃষ্টান্ত রেখেছিল। বৌদ্ধ মন্দির ও বিহারের উপর চীনের শিল্পনীতির প্রভাব ভাল ভাবে বোঝা যায়। চীনের ইতিহাস এবং সাহিত্য জাপানকে পথ দেখিয়েছিল।

রাজতন্ত্রের দুর্বলতা ও সামন্তদের শক্তি

নারা যুগে শক্তিশালী সামন্তদের চাপে রাজতন্ত্র ও কেন্দ্রীয় শাসন দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সামন্তরা কর-মুক্ত বিস্তীর্ণ জমি ভোগ করতেন। বিভিন্ন ধর্মীয় সংস্থাও এই সুবিধার অধিকারী ছিল। ধর্মীয় সংগঠনগুলিরও অনেক জমি ও অন্যান্য সম্পদ থাকত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্রাট এবং সাধারণ মানুষ এই সম্পদ ভোগের সুফল থেকে বঞ্চিত থাকতেন। ধর্মের নামে সংগঠনগুলি অন্যায় সুবিধা ভোগ করত। উত্তরাধিকার এবং গোষ্ঠী আনুগত্যের ব্যাপারে জাপান চীন থেকে আলাদা ছিল। সুতরাং জাপানে শিক্ষিত ও জাতীয় চেতনা সম্পন্ন আমলাতন্ত্র গড়ে ওঠে নি। এর ফলে দুর্বল কৃষকরা সামন্তদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য পেত না। তাদের জমি শক্তিশালী সামন্তদের হাতে চলে যেত। এই সামন্তরা প্রভাব খাটিয়ে সরকারী খাজনা থেকে অব্যাহতি পেতেন। এর ফলে রাজশক্তি আরও দুর্বল হয়ে পড়ত। সামন্তরা নিজেদের জমিদারিতে অত্যন্ত পরাক্রমের সঙ্গে বাস করতেন। রাজশক্তি সামন্তদের দ্বারা এবং সামন্তদের স্বার্থে পরিচালিত হত। নারা যুগে ফুজিওয়ারা গোষ্ঠী আধিপত্য স্থাপন করেছিল। তা ছাড়া, বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা কেন্দ্রীয় শাসনকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দুর্বল করে ফেলেছিল।

হেইয়ান যুগে (৮৯৪-১১৮৫ খ্রীস্টাব্দ) জাপানের চিন্তাধারা পরিণত

রূপ নিয়েছিল। এই সময়ে চীনে তাঙ সাম্রাজ্যের অবক্ষয়ের সূচনা হলে জাপান আর অন্ধভাবে চীনের অনুকরণ করতে চাইল না। এই সময়ে জাপানে বৌদ্ধধর্ম জাতীয় চরিত্র লাভ করে। সম্রাট কাম্মু 'শান্তির শহর' হেইয়ানকিও অথবা কিয়োটোতে রাজধানী স্থানান্তরিত করে রাজতন্ত্রের উপর বৌদ্ধধর্মের ক্ষমতা খর্ব করে। এর জন্য তিনি জাতীয়তাবাদী শিণ্টোধর্মের সাহায্য নিয়েছিলেন। কিয়োটো তাঙ রাজধানী চাঙ-আনের অনুকরণে নির্মিত হয়। এইসব পরিবর্তন সত্ত্বেও সম্রাট কেবলমাত্র নামেই ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সম্রাটরা ফুজিওয়ারা পরিবারের হাতের পুতুল ছিলেন। ফুজিওয়ারা পরিবার বহু জমির অধিকারী ছিল। এই পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে সম্রাটদের বিবাহ হত। সুতরাং রাজধানী ও রাজদরবারে এই পরিবারের প্রভাব ছিল। বড় বড় সরকারী পদে এই পরিবারের সদস্যরা নিযুক্ত হতেন এবং নাবালক সম্রাটরা এই পরিবার-কর্তৃক পরিচালিত হতেন। এই পরিবার থেকে রাজ-প্রতিনিধি (সেশো) এবং অসামরিক প্রশাসক (কাম্পাকু) নিযুক্ত হতেন। যাঁরা ফুজিওয়ারা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না, তাঁদের উচ্চাভিলাষ পূর্ণ হবার সম্ভাবনা ছিল না। তাঁদের অনেকে ভাগ্যান্বেষণে দূরবর্তী দেশে যেতে বাধ্য হতেন। কালক্রমে বিভিন্ন প্রদেশে ফুজিওয়ারা গোষ্ঠীর বাইরে সামরিক দক্ষতা-সম্পন্ন এক অভিজাত সম্প্রদায় তৈরী হয়। এই নতুন অভিজাতরা কেন্দ্রীয় শাসকদের ক্ষমতার বিরোধী ছিলেন এবং নিজেদের স্থানীয় প্রভাব বাড়াতে সচেষ্ট ছিলেন। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে সামন্তপ্রথা জাপানের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ঐক্যকে দুর্বল করে ফেলে। সামন্তরা অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তিতে স্বাবলম্বী ছিলেন। তাঁদের সৈন্যরা (বুসি অথবা সামুরাই) দক্ষ ও সাহসী ছিল। সামন্তরা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতেন। ফুজিওয়ারা গোষ্ঠীর সামরিক ক্ষমতা কমে গেলে রাজধানী কিয়োটোর নিরাপত্তা প্রাদেশিক সামন্তদের উপর নির্ভর করত। এইজন্য ফুজিওয়ারা গোষ্ঠী নতুন প্রাদেশিক সামন্তদের সাহায্য নিতে বাধ্য হয়েছিল। অবশ্য তাতেও সমস্যার সমাধান হয় নি। টাইরা এবং মিনামোটোর সামরিক গোষ্ঠীর সংঘর্ষের ফলে কিয়োটোর অসামরিক শক্তির পতন ঘটে।

শোগুন ও সামাজিক বৈষম্য

পরবর্তী অধ্যায়ে জাপানে সামরিক অভিজাত শ্রেণীর আধিপত্যের সূচনা হল। এই অভিজাতরা প্রদেশগুলিতে তাঁদের ক্ষমতা সংহত করেছিলেন। এই কঠোর এবং যুদ্ধপ্রিয় অভিজাত শ্রেণী চীনের জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ করেছিলেন এবং নতুন সমাজ ও প্রশাসনের কথা ভেবেছিলেন। মিনামোটো ইউরিটোমো ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সামরিক ও সামন্তশ্রেণীর শাসন (১১৮৫-১৩৩৮ খ্রীস্টাব্দ) শুরু হয়। ইউরিটোমো সমুদ্র-তীরের গ্রাম কামাকুরা থেকে শাসন করতেন। তিনি সম্রাট, ফুজিওয়ারা পরিবার এবং অসামরিক অভিজাত গোষ্ঠীকে প্রশাসন থেকে সরিয়ে দেন নি। তিনি প্রকৃত শাসক হলেও দেখান হত যেন সম্রাটই দেশ শাসন করছেন। সুতরাং বাস্তব ও কাগজে-কলমে পরিস্থিতির মধ্যে বিরাট পার্থক্য ছিল। এই পার্থক্য আরও বাড়ল যখন ইউরিটোমো সম্রাটের কাছ থেকে সর্বাধিনায়ক অথবা শোগুন উপাধি গ্রহণ করলেন। এর ফলে ইউরিটোমো সমস্ত সামরিক বাহিনীর অধিনায়কত্ব পেলেন। আইনের দিক থেকে ইউরিটোমো সম্রাটের সৈন্যবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত হলেন। আসলে তিনি পরিবার ও বন্ধুত্বের সূত্রে আবদ্ধ অভিজাতদেরই সেনাপতি হলেন। এই সামরিক সংগঠন সামন্তপ্রথার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল এবং এটাই ছিল জাপানের প্রকৃত প্রশাসন। শোগুন উপাধি ও পদ ইউরিটোমোর পরিবারের সঙ্গে উত্তরাধিকারসূত্রে জড়িত হয়ে পড়ে এবং এর ফলে এই পদের গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পায়।

এইভাবে সামন্তপ্রথা জাপানের প্রশাসনকে আচ্ছন্ন করল। মিনামোটোগোষ্ঠীর অভিজাতরা জাপানের বিভিন্ন অঞ্চলে ভূমি-ব্যবস্থা পরিচালনা করতেন মিনামোটো শোগুনদের আমলে ঐ গোষ্ঠীর জমি প্রধানত পূর্ব জাপানে অবস্থিত ছিল। শোগুনের ক্ষমতা এক এক জায়গায় এক এক রকম ছিল। মিনামোটোগোষ্ঠীর সমর্থনের উপর শোগুনের সামরিক একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। সম্রাট কার্যত ক্ষমতাহীন হলেও তাঁর কাছ থেকে শোগুন ক্ষমতা পেয়েছিলেন এবং সম্রাটের নামে শোগুন রাজ্য চালাতেন। সম্রাট কিয়োটোকে জাঁকজমক ও সমাজিক মর্যাদার মধ্যে বাস

করতেন। তিনি ছিলেন জাতীয় ঐক্যের একমাত্র প্রতীক, কারণ সামন্তযুগে অভিজাতদের জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী ছিল না। অভিজাতরা শোগুনকে রাজার প্রতিনিধি হিসাবে এবং সামরিক শক্তির অধিকারী হিসাবে মানতেন। প্রায় সাতশ বৎসর ধরে শোগুনের শাসন চলেছিল। জাপানের সামন্তপ্রথায় কনফুশিয়াসের দর্শন অনুযায়ী মনে করা হত যে, ভাল ও ন্যায়সঙ্গত প্রশাসন প্রধানত সুনীতির উপর নির্ভর করে। তা ছাড়া, জাপানের মধ্যযুগীয় সমাজ ও প্রশাসনে সামরিক ব্যক্তিদের বিশেষ গুরুত্ব ছিল। সামাজিক শ্রেণীবৈষম্যের ক্ষেত্রে জাপান চীনের অনুকরণ করে নি। সম্রাটের পরিবার, আত্মীয়-স্বজন এবং প্রাসাদের অভিজাতরা (কুজ) সবচেয়ে বেশি সামাজিক মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। অবশ্য এই অভিজাতদের জমির পরিমাণ খুব বেশি হত না। সম্রাটের জমি ও আয় শোগুন-কর্তৃক নির্ধারিত হত। পরবর্তী সামাজিক শ্রেণী সামুরাই-এর হাতে সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল। সামুরাইদের মধ্যে অনেক ভাগ ছিল। সবচেয়ে উপরে ছিলেন স্বয়ং শোগুন। পরবর্তী বিভিন্ন ধাপে ছিলেনঃ (১) ডাইমিও অথবা ধনী অভিজাত; (২) শোগুনের অনুগত হাতামোতো এবং গোকোনিন—যাঁদের সামরিক ও অসামরিক কাজ করতে হত; (৩) বাইসিন—যাঁরা ডাইমিও অথবা হাতামোতোর অধীনস্থ ছিলেন এবং সরকারী প্রশাসনে অথবা পদাতিক সৈন্য হিসাবে কাজ করতেন; (৪) রনিন ও সাধারণ সৈন্য এবং (৫) গোসি অথবা কৃষক। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে বৈষম্য ছিল। এমন কি, কৃষকদের মধ্যেও শ্রেণীভেদ ছিল। স্বচ্ছল কৃষকরা গ্রামের প্রধান হতেন, কিন্তু ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যাও অনেক ছিল। শহর অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে কারিগর এবং বণিক শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল। অবশ্য সামন্ত সমাজের ভাল দিকও ছিল। বহু শতাব্দী ধরে এই সমাজ জাপানের রাজনীতি ও সংস্কৃতি নিয়ন্ত্রণ করেছিল। মাঝে মাঝে অরাজকতা সত্ত্বেও সব মিলিয়ে একটা প্রশাসনিক কাঠামো ছিল। ইউরোপের নাইটদের মত সামুরাইদের হাতে শান্তি ও শৃঙ্খলা-রক্ষার ভার ছিল। তাঁরা দুষ্টকে দমন, শিষ্টকে পালন এবং কিছু নৈতিক আদর্শ মেনে চলবার চেষ্টা করতেন। তাঁদের বীরধর্ম

'বুসিডো' নামে পরিচিত। স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ ও শিশুকে রক্ষা করা ছিল তাঁদের কর্তব্য। কালক্রমে যোদ্ধাদের ব্যবহার-বিধি প্রচলিত হয়েছিল। ব্যক্তিগত আনুগত্য ও পারিবারিক বন্ধনের জন্য তাঁরা মৃত্যুবরণ করতেও কুণ্ঠিত হতেন না। এই বীর যোদ্ধারা ধর্ম ও সংস্কৃতির অনুরাগী ছিলেন।

ইউরিটোমোর মৃত্যুর পর (১১৯৯ খ্রীস্টাব্দ) তাঁর স্ত্রীর হোজো পরিবারের হাতে শোগুনের পদ চলে গিয়েছিল (১২০৩-১৩৩৩ খ্রীস্টাব্দ)। ১২৮১ খ্রীস্টাব্দে প্রাকৃতিক দুর্যোগ জাপানকে কুবলাই খানের নৌ-আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। ১৩৩১ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট গোডাইগো ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হন। দেশে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হলে ১৩৩৮ খ্রীস্টাব্দে আসিকাগা টাকাউজি শোগুনের পদ অধিকার করেন। আসিকাগার শোগুনতন্ত্র ১৫৭৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত জাপান শাসন করেছিল।

দ্বাদশ অধ্যায়

মধ্যযুগে ভারত

হূণ আক্রমণঃ যে দুর্ধর্ষ হূণজাতির আক্রমণে রোমান সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হয়েছিল তাদের একটি শাখা অক্ষুনদীর অববাহিকা অঞ্চলে বসবাস করতে লাগল। এরাই শ্বেত হূণ নামে পরিচিত। সাহসী ও যুদ্ধ-নিপুণ এই জাতি প্রকৃতিতে অতি নিষ্ঠুর ছিল। তাদের রণপিপাসা ও যাযাবরপ্রকৃতির জন্যই তাদের সভ্যতা ততটা সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে নি। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে হূণরা পারস্য জয় করে। তারপর ভারত সীমান্তে কুষাণ অধিপতিকে হারিয়ে তারা কাবুল জয় করে। মধ্য-এশিয়ার খোটান থেকে পারস্য পর্যন্ত বিস্তৃত হূণ সাম্রাজ্যের রাজধানী হল আফগানিস্তানের বামিয়ান। এবার তাদের নজর পড়ল সুজলা-সুফলা ভারতবর্ষের দিকে।

ভারতে তখন গুপ্ত সাম্রাজ্যের গৌরব অস্তমিতপ্রায়। এই বংশের শেষ পরাক্রমশালী রাজা কুমারগুপ্তের রাজত্বের (আনুমানিক ৪১৫-৫৫ খ্রীস্টাব্দ) শেষভাগে হূণরা ভারত আক্রমণ করে। কিন্তু

শক্তিসংগ্রহের জন্য হর্ষবর্ধন কামরূপরাজ ভাস্করবর্মণের সঙ্গে মিত্রতা-স্থাপন করলেন। শশাঙ্ক বুদ্ধিমানের মত কনৌজ ত্যাগ করে নিজ রাজ্যে ফিরে গেলেন। এর পর হর্ষবর্ধন রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করেন। তবে শশাঙ্কের জীবিতাবস্থায় তাঁর অধিকৃত রাজ্যের একাংশও হর্ষবর্ধন পুনরুদ্ধার করতে পারেন নি। প্রধানত বাণভট্ট-রচিত হর্ষচরিত ও চৈনিক পরিব্রাজক হিউ-এন সাঙের বিবরণী থেকে আমরা হর্ষবর্ধন সম্পর্কে জানতে পারি।

কনৌজ ও থানেশ্বরের মন্ত্রীদের অনুরোধে হর্ষবর্ধন উভয় রাজ্যের দায়িত্ব নিলেন। হর্ষ 'শিলাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করেন। কনৌজ তাঁর রাজধানী হল। হিউ-এন সাঙ লিখেছেন যে, ছয় বৎসর ক্রমাগত যুদ্ধ করে হর্ষ পঞ্চ ভারত বা পাঞ্জাব, কনৌজ, গৌড়, মিথিলা ও উড়িষ্যা দখল করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, শশাঙ্কের মৃত্যুর পরই হর্ষ গৌড়ের অধিকাংশ ও উড়িষ্যা দখল করেন। গুজরাট বলভীর রাজা ধ্রুবসেন হর্ষকর্তৃক পরাজিত হন। সিন্ধুদেশেও হর্ষবর্ধনের অধিকার প্রসারিত হয়েছিল। হর্ষ কাশ্মীর আক্রমণ করেছিলেন। মগধ এবং কঙ্গোদ তাঁর দখলে আসে। চালুক্যলিপি হর্ষকে 'উত্তরাপথ নাথ' বলে অভিহিত করেছে। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে হর্ষ চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর কাছে প্রতিহত হলেন। হর্ষবর্ধন নর্মদানদীর দক্ষিণে প্রভাববিস্তার করতে পারেন নি। গুপ্তযুগের পর সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য আমরা আর দেখতে পাই না। হর্ষবর্ধনের রাজ্য উত্তর ভারতের একটি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল।

হর্ষবর্ধন

হিউ-এন সাঙ

সপ্তম শতাব্দীতে হিউ-এন সাঙ নামে চীন থেকে একজন বৌদ্ধ পরিব্রাজক ভারতে এসেছিলেন। বুদ্ধের জন্মস্থান পরিদর্শন করা ও

বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে জানার আগ্রহে অনেক কষ্ট সহ্য করে তাঁকে ভারতে আসতে হয়েছিল। তিনি সম্রাট হর্ষবর্ধনের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং হর্ষের সাম্রাজ্যে প্রায় আট বৎসর বাস করেছিলেন। তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে দশ বৎসর পণ্ডিত শীলভদ্রের কাছে শিক্ষা-লাভ করেন। তাঁর রচনা থেকে তৎকালীন ভারত সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য জানা যায়।

হিউ-এন সাঙ

হিউ-এন সাঙ ভারতীয়দের চরিত্রের খুব প্রশংসা করেছেন। তারা সৎ ও সরল ছিল। তারা সংযত ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন করত ও ধর্মভীরু ছিল। বৌদ্ধ-ধর্মের প্রভাব কম ছিল এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রভাব বাড়ছিল। প্রধান দেবতা ছিলেন আদিত্য, শিব ও বিষ্ণু। জৈনধর্মের প্রভাব খুব সীমাবদ্ধ ছিল। বিভিন্ন ধর্মের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ছিল। অনেক ধ্বংসোন্মুখ বৌদ্ধ মঠ হিউ-এন সাঙের নজরে এসেছিল। গৌড়ের রাজা শশাঙ্ককে তিনি বৌদ্ধ-বিদ্বেষী বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, শশাঙ্ক বোধিবৃক্ষটি কেটে ফেলেছিলেন। হিউ-এন সাঙ মুক্তকণ্ঠে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর প্রশংসা করেছেন। কামরূপরাজ ভাস্করবর্মণ হিউ-এন সাঙ-এর গুণগ্রাহী ছিলেন। হিউ-এন সাঙ মোট ১৩৮টি ভারতীয় রাজ্যের উল্লেখ করেছেন। হর্ষবর্ধনের রাজত্ব সম্পর্কে অনেক কিছু লিখেছেন। সম্রাট ব্যক্তিগতভাবে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। দণ্ডবিধি কঠোর ছিল। রাজকর্মচারীরা বেতনের পরিবর্তে জমি পেতেন। নানাভাবে কৃষকদের সাহায্য করা হত। বেগার খাটানোর প্রথা ছিল না। হর্ষবর্ধন ধার্মিক, প্রজাবৎসল ও দানশীল ছিলেন। হর্ষের সাম্রাজ্য কয়েকটি ভুক্তি বা প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক

ভুক্তিতে কয়েকটি বিষয় বা জেলা ছিল। করভার লঘু ছিল। কৃষকদেরকে উৎপন্ন শস্যের এক-ষষ্ঠাংশ রাজকর দিতে হত। রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ বিদ্বান্ ও সাহিত্যিকদের জন্য রাখা হত। হর্ষবর্ধন

হিউয়েনসাঙের ভারতে আগমন ও প্রত্যাগমন পথ

বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। 'কাদম্বরী' ও 'হর্ষচরিত' প্রণেতা বাণভট্ট তাঁর সভাকবি ছিলেন। হর্ষ নিজে 'রত্নাবলী', 'প্রিয়দর্শিকা' ও 'নাগানন্দ' নামে তিনটি নাটক রচনা করেছিলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ-পরীক্ষার মান খুব উঁচু ছিল। শতকরা কুড়ি বা ত্রিশ জনের বেশি প্রার্থী এই পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে পারতেন না। দ্বারপণ্ডিত নামে অধ্যাপকরা এই পরীক্ষার ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সবাইকেই পরীক্ষা দেবার সুযোগ দেওয়া হত। বহু পণ্ডিত এখানে অধ্যাপনা করতেন। তাঁদের মধ্যে চন্দ্রগোমী, দিগনাগ, ধর্মপাল, শীলভদ্র, নারোপা প্রভৃতির নাম বিখ্যাত। হিউ-এন সাঙ যখন এখানে এসেছিলেন তখন প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন বাঙালী পণ্ডিত শীলভদ্র। এখানকার ছাত্ররা সর্বদা অধ্যয়নে ব্যস্ত থাকতেন। আলোচনা ও বিতর্কের মাধ্যমে বিদ্যাচর্চা হত। নালন্দায় তিনটি বিশাল গ্রন্থাগার ছিল। এই গ্রন্থাগারগুলিকে যথাক্রমে 'রত্নসাগর', 'রত্নরঞ্জক' ও 'রত্নদধি' বলা হত। বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র, বিশেষত মহাযানধর্ম ও দর্শন অধ্যয়নের উপর জোর দেওয়া হত। তবে ব্যাকরণ, ন্যায়, আয়ুর্বেদ, গণিত, মীমাংসা, জ্যোতিষ, ছন্দ প্রভৃতিও পড়ানো হত। এ ছাড়া, জৈন ও হিন্দুধর্মমতসম্বন্ধীয় দর্শনও এখানে আলোচিত হত। সুবর্ণভূমির রাজা বলপুত্রদেব নালন্দায় একটি মঠ তৈরি করেছিলেন। মঠের খরচ চালাবার জন্য মহারাজ দেবপাল পাঁচটি গ্রাম দান করেছিলেন। হর্ষবর্ধনও নালন্দার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। চরিত্রগঠনের দিকে নজর দেওয়া হত। হিউ-এন সাঙ লিখেছেন, সাতশ বৎসরের মধ্যে নালন্দার কোন ছাত্র নিয়মভঙ্গ করে নি। তাঁর মতে, ভারতবর্ষে অসংখ্য শিক্ষাকেন্দ্র থাকলেও নালন্দা অতুলনীয় ছিল। এখানে দশ হাজার ছাত্র অধ্যয়ন করতেন। পাঠ সমাপ্ত হলে তাঁরা অধ্যাপকের সভার সম্মুখীন হতেন। নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে তাঁরা উত্তীর্ণ হতেন। রাজারা তাঁদের মানপত্র দিতেন। ছাত্ররা বিশাল ভবনে বাস করতেন। হিউ-এন সাঙ বলেছেন, প্রায় একশটি গ্রাম থেকে সংগৃহীত রাজস্ব শিক্ষার উদ্দেশ্যে
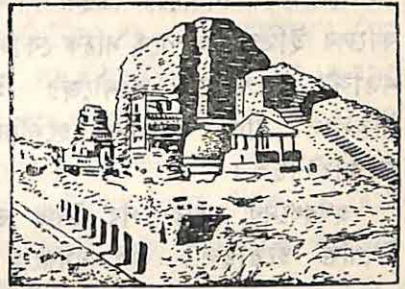
নালন্দা-বিশ্ববিদ্যালয়

ব্যয় করা হত। ঐ সব গ্রামের অধিবাসী পালা করে প্রতিদিন শিক্ষক ও ছাত্রদের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাত।

রাজনৈতিক অরাজকতা ও রাজপুত যুগ

৬৪৭ খ্রীস্টাব্দে হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্য ভেঙ্গে গেল। বহু ক্ষুদ্র রাজ্যের উদ্ভব হল। তিব্বতের শক্তিশালী রাজা স্রঙ্‌-সাম্‌-গাম্‌-পো কনৌজের শাসক অর্জুনকে বন্দী করেছিলেন। এবং ৭০৩ খ্রীস্টাব্দে উত্তর বিহারের ত্রিহুত অঞ্চল দখল করেছিলেন। পরবর্তী কালের ইতিহাস সম্পর্কে সঠিক কোন ধারণা করা যায় না। অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্ধে কনৌজের সিংহাসনে যশোবর্মা নামে এক শক্তিশালী রাজা অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর রাজত্বকাল স্বল্পস্থায়ী ছিল।

হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর উত্তর ভারতে অনেক রাজপুতরাজ্যের উৎপত্তি হয়েছিল। এই সময়কে অনেকে 'রাজপুত-যুগ' বলে থাকেন। রাজপুতবংশগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। গুর্জর-প্রতিহার বংশের কীর্তি উল্লেখযোগ্য। উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তাঁরা সাম্রাজ্যস্থাপন করেছিলেন। অন্যান্য রাজপুত-বংশের মধ্যে আজমীর ও দিল্লী অঞ্চলের চৌহান, বুন্দেলখণ্ডের চন্দেল্ল, জব্বলপুরের কল্‌চুরি, মালবের পরমার এবং কনৌজের গাহড়বাল-বংশ উল্লেখযোগ্য। গুজরাটে ও কাথিয়াবাড়ে চৌলুক্য বা শোলাঙ্কি-বংশ প্রায় সাড়ে তিনশ বৎসর রাজত্ব করেছিল। হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে রাজপুতদের অবদান উল্লেখযোগ্য। কিন্তু রাজপুতদের সামন্তসমাজ রাজপুত-শক্তিবৃদ্ধির সহায়ক ছিল না। রাজপুত-অর্থনীতি জমি ও কৃষির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যর যথেষ্ট প্রসার ছিল না। জমি অনেক ক্ষেত্রে উর্বর ছিল না। সুতরাং রাজপুত অর্থনীতি যথেষ্ট বিকাশলাভ করতে পারে নি। সামন্তসমাজে শ্রেণীবৈষম্য ছিল। প্রত্যেকটি রাজপুতরাজ্যে বড় বড় সর্দারের হাতে অর্থ নৈতিক ও সামরিক ক্ষমতা থাকত। রাজাকে তাঁদের উপর নির্ভর করতে হত। জনসাধারণ প্রত্যক্ষভাবে সর্দারদের প্রতি অনুগত থাকত। এর ফলে জাতীয় চেতনা অপেক্ষা স্থানীয়

চেতনা ও আনুগত্য বেশি কার্যকরী হত। অবশ্য ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগতভাবে রাজপুতরা বীরত্বের জন্য বিখ্যাত ছিল।

কনৌজ ও ত্রিপাক্ষিক দ্বন্দ্ব

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রকূটবংশ, বাংলার পালবংশ ও গুর্জর দেশের প্রতিহারবংশের মধ্যে কনৌজ তথা উত্তর ভারতের আধিপত্যপ্রতিষ্ঠার জন্য এক ত্রি-পাক্ষিক বিরোধের সূত্রপাত হয়েছিল। বিভিন্ন সময়ে ত্রি-পাক্ষিক সংঘর্ষে বিভিন্ন শক্তি সাফল্য অর্জন করেছিল। গুর্জররাজ ও বৎসরাজ কনৌজ দখল করেছিলেন। সম্ভবত পালরাজ ধর্মপাল (আনুমানিক ৭৭০-৮১০ খ্রীস্টাব্দ) তাঁর কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। এর পর রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব (৭৭৯-৭৯৩ খ্রীস্টাব্দ) উত্তর ভারতে অভিযান করে ধর্মপাল ও বৎসরাজকে পরাজিত করেন। ধ্রুব স্বদেশে ফিরে যাবার পর ধর্মপাল আবার কনৌজ নিজের দখলে আনেন। নবম খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকে গুর্জররাজ দ্বিতীয় নাগভট্ট কনৌজ দখল করলেন এবং ধর্মপালকে পরাজিত করলেন। কিন্তু রাষ্ট্রকূট-রাজ তৃতীয় গোবিন্দ (৭৯৪-৮১৫ খ্রীস্টাব্দ) নাগভট্টকে পরাজিত করে কনৌজ দখল করেন। তিনিও তাঁর পিতার মত দক্ষিণে ফিরে যান। যদিও রাষ্ট্রকূট তথ্য-অনুযায়ী ধর্মপাল তৃতীয় গোবিন্দের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। সম্ভবত ধর্মপাল গোবিন্দকে নাগভট্টের বিরুদ্ধে সাহায্য করেছিলেন। তার বদলে ধর্মপাল আশ্রিত চক্রায়ুধকে আবার কনৌজের সিংহাসনে বসাতে পেরেছিলেন। মিহিরভোজ (আনুমানিক ৮৩৬-৮৫ খ্রীস্টাব্দ) প্রতিহার শক্তি ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলেন। সম্ভবত তিনি কনৌজ অধিকার করেছিলেন, যদিও পাল-লিপি অনুযায়ী দেবপাল (আনুমানিক ৮১০-৫০ খ্রীস্টাব্দ) গুর্জরদের পরাজিত করেছিলেন। রাষ্ট্রকূট রাজা প্রথম অমোঘবর্ষ (৮১৫-৭৭ খ্রীস্টাব্দ) শান্তিপ্রিয় ছিলেন বলে উত্তর ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণ করেন নি। কিন্তু দশম শতাব্দীর প্রথমভাগে রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় ইন্দ্র গুর্জররাজ মহীপালকে পরাজিত করে সাময়িকভাবে কনৌজ অধিকার করলেন। কালের প্রভাবে ক্রমশ পাল, প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূটশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ল। উত্তর ভারতে আধিপত্যের প্রশ্নের কোন সুষ্ঠু সমাধান হল

না। এই তিন শক্তির কেউ বেশিদিন তাদের সাফল্য বজায় রাখতে পারে নি। তারা এক ধরনের শক্তির ভারসাম্য তৈরি করেছিল। সবাইকে পদানত করে একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা কোনও একটি শক্তির পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিন শক্তির অবক্ষয় ঘটলে কনৌজ গাহড়বালদের অধীনে এল। এর পরে মুসলমান আক্রমণ উত্তর ভারতে মৌলিক রাজনৈতিক পরিবর্তন আনল।

বাংলাদেশ ও শশাঙ্ক

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পরে বাংলাদেশের দুটি রাজ্য প্রাধান্য-লাভ করেছিল। তাদের মধ্যে একটি বঙ্গ, অন্যটি গৌড়। গৌড়ের রাজা মহাসেনগুপ্তকে যুদ্ধে পরাজিত করে শশাঙ্ক সিংহাসন দখল করলেন। সম্ভবত শশাঙ্ক মহাসেনগুপ্তের সামন্ত ছিলেন। আনুমানিক ৬০৬ খ্রীস্টাব্দের আগেই শশাঙ্ক রাজা হয়ে বাংলায় রাজনৈতিক ঐক্য আনলেন। মুর্শিদাবাদের কাছে কর্ণসুবর্ণে শশাঙ্কের রাজধানী ছিল। তারপর শশাঙ্ক মগধ, উৎকল ও কোঙ্গোদ দখল করলেন। তিনি মালবরাজ দেবগুপ্তের সাহায্যে কনৌজের গ্রহবর্মণকে হত্যা করেন। রাজ্যবর্ধনের হাতে দেবগুপ্ত পরাজিত ও নিহত হলে শশাঙ্ক রাজ্য-বর্ধনকে হত্যা করেন। গঞ্জামের তাম্রলিপি (৬১৯ খ্রীস্টাব্দ) থেকে জানা যায়, শশাঙ্ক আমৃত্যু পূর্ণ ক্ষমতা ভোগ করেছিলেন। হিউ-এন সাঙ লিখেছেন, মৃত্যুর সময় শশাঙ্ক মগধের অধীশ্বর ছিলেন। মা-টোয়ান-লিউর লেখা থেকে বোঝা যায়, শশাঙ্কের জীবদ্দশায় হর্ষবর্ধন তাঁর রাজ্য অধিকার করতে পারেন নি।

শশাঙ্কের স্বর্ণমুদ্রায় বৃষ ও শিবের মূর্তি প্রমাণ করে তিনি শৈব ছিলেন। হিউ-এন সাঙ-এর বৃত্তান্ত এবং মঞ্জুশ্রীমূলকল্প শশাঙ্কের বৌদ্ধবিদ্বেষের পরিচয় দেয়। অনেকে মনে করেন, রাজনৈতিক কারণে শশাঙ্ক বৌদ্ধদের প্রতি কঠোর হয়েছিলেন। হিউ-এন সাঙ স্বীকার করেছেন, শশাঙ্কের রাজধানীতে বৌদ্ধধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।

সম্ভবত ৬১৯ খ্রীস্টাব্দের পর এবং ৬৩৭-৩৮ খ্রীস্টাব্দের আগে শশাঙ্কের মৃত্যু হয়। বাংলার ইতিহাসে তিনিই প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজা। পরবর্তী কালে পাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা শশাঙ্কের পথেই সম্ভব হয়েছিল। বাণভট্ট এবং হিউ-এন সাঙ-এর মত বিরূপ

মনোভাবের লেখকদের হাতে শশাঙ্কের খ্যাতি ও চরিত্র কলুষিত হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত শশাঙ্কের কৃতিত্ব সমসাময়িক লেখকরা লিপিবদ্ধ করেন নি।

পাল যুগ

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলাদেশে অরাজকতা দেখা দিল। ধর্মপালের খালিমপুর লিপিতে একে মাৎস্যন্যায় বলে বর্ণনা করা হয়েছে। ৭৫০ খ্রীস্টাব্দে জনগণ ও স্থানীয় প্রধানরা দেশের স্বার্থে গোপালদেবকে রাজপদে নির্বাচিত করলেন। গোপালের পুত্র ধর্মপাল (৭৭০-৮১০ খ্রীস্টাব্দ) উত্তর ভারতে পালসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর পুত্র দেবপাল (৮১০-৮৫০ খ্রীস্টাব্দ) পালসাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করেছিলেন। বাদলস্তম্ভলিপিতে তাঁর রাজ্যজয়ের বর্ণনা আছে। ভারতের বাইরেও তাঁর খ্যাতি ছিল। একাদশ খ্রীস্টাব্দের মধ্যভাগ থেকে পালবংশের অবনতি হতে থাকে। রামপাল (১০৭৭-১১২০ খ্রীস্টাব্দ) পূর্ব গৌরবের কিছুটা ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলেন। তাঁর দুর্বল বংশধরদের আমলে পালরাজ্য ভেঙ্গে যায়।

সেন যুগ

এর পর বাংলায় সেনযুগের সূচনা হল। প্রথম যুগের সেনদের মধ্যে সামন্তসেনের নাম পরিচিত। তাঁর ছেলে হেমন্তসেন একাদশ খ্রীস্টাব্দের শেষদিকে রাঢ় অঞ্চলে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন। তাঁর ছেলে বিজয়সেনের আমলে (১০৯৫-১১৬০ খ্রীঃ) সেনগৌরবের সূচনা হয়। তিনি প্রায় সমস্ত বাংলাদেশ জয় করলেন। বিজয়সেনের ছেলে বল্লালসেনের (১১৫৮-৭৮ খ্রীস্টাব্দ) রাজ্য বঙ্গ, রাঢ়, বরেন্দ্র ও মিথিলা নিয়ে গঠিত হয়েছিল। তাঁর ছেলে লক্ষ্মণসেন (১১৭৮-১২০৫ খ্রীস্টাব্দ) বিভিন্ন রাজ্য জয় করেছিলেন। মুসলমান আক্রমণের পর তিনি পূর্ব বাংলায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। সম্ভবত ১২৪৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় সেনশাসন বর্তমান ছিল।

পাল ও সেন যুগে সমাজ

পাল ও সেনযুগ বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে একটি

গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই সময়ে হিন্দুসমাজে জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। সবাইকে নানারকমের শাস্ত্রীয় অনুশাসন মেনে চলতে হত। পালরা বৌদ্ধ হলেও পরবর্তী কালে বৌদ্ধধর্মের অবনতি সমাজে ভাঙ্গনের সূচনা করেছিল। সেনযুগে ব্রাহ্মণ্য অথবা হিন্দুধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সমাজে নতুন প্রাণের সঞ্চার করেছিল। সামাজিক সংস্কারের ক্ষেত্রে বল্লালসেনের অবদান উল্লেখযোগ্য। অবশ্য জাতিগত বৈষম্য তখনও তীব্র আকার ধারণ করে নি। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ ও অন্যান্য সামাজিক সম্পর্ক ছিল, তবে উচ্চ-জাতির সঙ্গে শূদ্রের বিবাহ-সম্পর্ক স্বাভাবিক ছিল না। এক সঙ্গে ভোজনের বাধা-নিষেধ ধীরে ধীরে তৈরি হয়। চণ্ডালের স্পর্শ করা জলপান উচ্চজাতির পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। ক্রমশ এই সব বাধা-নিষেধ গোঁড়ামিতে পরিণত হয়। ব্রাহ্মণদের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তর ভারত থেকে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বাংলায় এসে বসবাস শুরু করেন। পরে ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়—যেমন রাঢ়ী, বারেন্দ্র এবং বৈদিক। এই সঙ্গে তাঁদের বংশপরিচয় বা কুলজী তৈরি হয়। কথিত আছে গৌড়ের রাজা আদিশূর যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য কনৌজ থেকে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে নিয়ে আসেন এবং বাংলায় বসবাসের জন্য গ্রাম দান করেন। তাঁরা নাকি পরবর্তী কালের বাঙালী ব্রাহ্মণদের অধিকাংশের পূর্বপুরুষ। এই সময়ে কুলীন-প্রথার উদ্ভব হয়। কুলীন ব্রাহ্মণরা সবচেয়ে বেশি মর্যাদার অধিকারী হন। তবে সমসাময়িক তথ্য থেকে আদিশূর ও কুলীনপ্রথাসম্পর্কে বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

পুরুষদের বহুবিবাহ প্রচলিত থাকলেও সমাজে মেয়েদের অবস্থা ভাল ছিল। ধোয়ীর কাব্য থেকে মনে হয়, লক্ষ্মণসেনের আমলে পর্দাপ্রথা ছিল না। স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন ছিল। তবে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ব্যাপারে পুরুষদের আধিপত্য ছিল। সেলাই ইত্যাদি কাজে মেয়েরা উপার্জনের সুযোগ পেতেন। বিধবাদের যথেষ্ট সামাজিক মর্যাদা ছিল না।

অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতার ফলে বাঙালীর জীবনে বার মাসে তের পার্বণ লেগে থাকত। করতাল, বীণা, বাঁশি, মৃদঙ্গ, ঢাক প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন ছিল। শিকার, কুস্তি প্রভৃতির প্রচলন ছিল।

দাবা, পাশা প্রভৃতি খেলা স্ত্রী-পুরুষের প্রিয় ছিল। জুয়া খেলারও প্রচলন ছিল।

ধুতি ও শাড়ি ছিল বাঙালীদের প্রধান পোশাক। অনুষ্ঠানে যেতে হলে বিশেষ পোশাক ও চাদর ব্যবহার করা হত। চামড়ার পাদুকা বা কাঠের খড়ম, লাঠি ও ছাতার প্রচলন ছিল। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই আংটি, হার, মেখলা, কুণ্ডল প্রভৃতি গয়না পরত। গ্রামের মেয়েরা ফুলের অলঙ্কার ব্যবহার করত।

একালের মত তখনও ভাত ছিল বাঙালীর প্রধান খাদ্য। এ ছাড়া, মাছ, মাংস এবং শাক-সব্জিও বাঙালীর প্রিয় ছিল। দুগ্ধজাত খাবার জনপ্রিয় ছিল। একমাত্র বাংলাদেশেই ব্রাহ্মণরা মাছ খেতেন। পান-সুপারী খাওয়া প্রচলিত ছিল। আম, কাঁঠাল, কলা ও নারিকেল বাঙালীরা ভালবাসত।

পাল যুগে ধর্ম, সাহিত্য ও শিক্ষা

পাল রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন বলে তাঁদের রাজত্বকালে বৌদ্ধ-ধর্মের বিশেষ প্রসার হয়েছিল। বাংলাদেশের বহু জায়গায় বৌদ্ধ-বিহার গড়ে উঠেছিল। এগুলির মধ্যে **বিক্রমশীলা, সোমপুর, উদ্দণ্ডপুর** প্রভৃতি বিখ্যাত। মহাযান বৌদ্ধধর্ম বেশি প্রচলিত ছিল। বিখ্যাত বৌদ্ধ দার্শনিক শান্তরক্ষিত গোপালের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি 'তত্ত্ব-সংগ্রহ' গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তারানাথ লিখেছেন, ধর্ম-পাল পঞ্চাশটি ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র নির্মাণ করেছিলেন। বিখ্যাত বৌদ্ধ লেখক হরিভদ্র ধর্মপালের কাছে গুরুর সম্মান পেতেন। হরিভদ্র প্রজ্ঞাপারমিতাসূত্রের টীকাকার এবং যোগাচারদর্শনের প্রচারক। তাঁর শিষ্য বুদ্ধজ্ঞানপদ যোগমন্ত্র প্রচার করেছিলেন। ধর্মপালের সময়ে প্রশান্তমিত্র অমৃতাকরে মঠ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরবর্তী পাল রাজাদের সময় কয়েকজন বৌদ্ধ পণ্ডিতের নাম পাওয়া যায়—যেমন সর্বজ্ঞদেব, জীনমিত্র, তিলোপা, জেতারি এবং কৃষ্ণ সমর বজ্র। কথ্য ভাষায় বৌদ্ধ গান ও মন্ত্রের প্রচলন হয়েছিল। এই ভাষাকে বলা হত মাগধী অপভ্রংশ। বৌদ্ধ-তান্ত্রিকরা এই ভাষা ব্যবহার করতেন। তাঁদের লেখা গান চর্যাপদ নামে পরিচিত। কৃষ্ণাচার্য,

ভূসুকু প্রভৃতি বাঙালী সিদ্ধাচার্যের চর্যাপদের পুথি পাওয়া গিয়েছে। এই চর্যাপদগুলি বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম সাহিত্য। এগুলি সহজিয়া গান—মহাযান-মতপ্রচারে সাহায্য করেছিল।

পাল রাজাদের ধর্মমত অত্যন্ত উদার ছিল। গর্ক, দর্ভপাণি, কেদার মিশ্র, গুরুবমিশ্র প্রভৃতি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত রাজসভায় উচ্চপদ লাভ করেছিলেন। বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রের চর্চা হত। পালযুগের বেশ কিছু সংস্কৃত শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। বাণগড় তাম্রলিপিতে মীমাংসা ও ব্যাকরণ এবং মুঙ্গের তাম্রলিপিতে বেদ-বেদান্তচর্চার উল্লেখ আছে। ধর্মপালের কালে বরেন্দ্র ব্রাহ্মণরা শ্রুতি, স্মৃতি, ব্যাকরণ ও কাব্যে পারদর্শী ছিলেন। অনেকে মনে করেন, ক্ষেমেশ্বরের 'চণ্ডকৌশিক' প্রথম মহীপালের আনুকূল্যে রচিত হয়। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' সংস্কৃত সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। এই কাব্যের শ্লোকগুলির দুটি অর্থ হয়। সাধারণ অর্থে রামায়ণের কাহিনী এবং বিশেষ অর্থে রামপালের ইতিহাস এতে পাওয়া যায়। পালযুগে চিকিৎসা-বিজ্ঞানেরও প্রসার হয়েছিল। মাধব 'রোগ বিনিশ্চয়' বা 'নিদান' নামে বই লিখেছিলেন। একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চক্রপাণি দত্ত 'চিকিৎসা-সংগ্রহ' লিখেছিলেন। চরক ও সুশ্রুতের উপর তাঁর দুই টীকা-গ্রন্থের নাম যথাক্রমে 'আয়ুর্বেদ-দীপিকা' ও 'ভানুমতী'। তাঁর অন্যান্য রচনার মধ্যে 'শব্দচন্দ্রিকা' ও 'দ্রব্যগুন সংগ্রহ' উল্লেখযোগ্য। সর্বশেষে রামপালের চিকিৎসক ভদ্রেশ্বরের নাম করা যেতে পারে।

পাল রাজারা বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। বিহারে অবস্থিত বিক্রমশীলা মহাবিহারের খ্যাতি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বৌদ্ধ-সংস্কৃতি প্রসারের উদ্দেশ্যে ধর্মপাল এই শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল, তিব্বত ও অন্যান্য দেশের ছাত্ররা এখানে আসতেন। রাষ্ট্রই ছাত্র এবং অধ্যাপকদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নিত। কৃতী ছাত্রদের সম্পদ ও অন্যান্য পুরস্কার দেওয়া হত। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের চর্চার জন্য এই বিশ্ববিদ্যালয় বিখ্যাত ছিল। তা ছাড়া, জ্যোতিষশাস্ত্র, ব্যাকরণ, চিকিৎসাশাস্ত্র, ন্যায়, দর্শন প্রভৃতির পঠনপাঠন হত। এখানে শিল্পকলাও শেখানো হত। পুথি নকল করা, চিত্রবিদ্যা প্রভৃতির চর্চা হত। বহু বিখ্যাত

পণ্ডিত বিক্রমশীলায় অধ্যাপনা করতেন। তাঁদের মধ্যে অতীশ দীপঙ্কর. রত্নাকরশান্তি, অভয়াকরগুপ্ত প্রভৃতির নাম বিখ্যাত। জীবনরক্ষিত এবং ধর্মশ্রীমিত্রের মত পণ্ডিত ভিক্ষুরা এখানে থাকতেন। তিব্বতের তারানাথ এই মঠের বজ্রাচার্যদের তালিকা দিয়েছেন। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের নাম অন্যতম দ্বারপণ্ডিত হিসাবে পাওয়া যায়।

তিব্বতের ইতিহাস থেকে জানা যায়, ধর্মপাল বিহারের উদ্দন্তপুরে একটি সুদৃশ্য মহাবিহার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তবে অনেকের মতে, এই মঠপ্রতিষ্ঠার কৃতিত্ব গোপাল অথবা দেবপালের প্রাপ্য। পাল-যুগেই এই মহাবিহার সবচেয়ে বেশি খ্যাতি অর্জন করেছিল। এখানে অতীশ দীপঙ্কর জ্ঞানচর্চা করে শ্রীজ্ঞান উপাধি লাভ করেছিলেন। এখানকার আচার্য শীলরক্ষিত তাঁকে ভিক্ষু হবার অনুমতি দেন। এখানকার অধ্যাপক ও ছাত্রদের রচিত বহু বই-এর নাম তিব্বতী তালিকায় পাওয়া যায়। ১১৯৯ খ্রীস্টাব্দে বক্‌তিয়ার খিলজী এই মঠ ধ্বংস করেছিলেন। এই মহাবিহারের কোন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আজও পাওয়া যায় নি।

সেনযুগের ধর্ম ও সাহিত্য

সেনযুগে সংস্কৃতের প্রসার ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্র ও কাব্যকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র প্রাত্যহিক জীবনের কর্তব্য সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করত। বল্লালসেনের গুরু অনিরুদ্ধ ভট্ট 'হারলতা' এবং 'পিতৃদায়িত্ব' রচনা করেন। বল্লালসেনের দুটি রচনার সন্ধান পাওয়া যায় না। তাঁর লেখা 'দানসাগর'-এ তেরশ পঁচাত্তর রকম দানের উল্লেখ আছে। 'অদ্ভুতসাগর'-এ শুভ ও অশুভ লক্ষণের তালিকা আছে। লক্ষ্মণসেনের মহামাত্য হলায়ুধ 'ব্রাহ্মণসর্বস্ব', 'মীমাংসাসর্বস্ব', 'বৈষ্ণবসর্বস্ব', 'শৈবসর্বস্ব' এবং 'পণ্ডিতসর্বস্ব' রচনা করেন। তাঁর দুই ভাই ঈশান এবং পশুপতি যথাক্রমে, 'আহ্নিকপদ্ধতি' ও 'শ্রাদ্ধপদ্ধতি'র লেখক। কয়েকজনের মতে, পুরুষোত্তম নামে জনৈক বৌদ্ধ বৈয়াকরণ লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক ছিলেন।

বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন ও কেশবসেন কাব্যচর্চা করতেন। ধোয়ী লক্ষ্মণসেনকে গৌড়ের বিক্রমাদিত্য বলেছেন। তাঁর সভায় পাঁচ রত্নের নাম করা হয়েছে—গোবর্ধন, শরণ, জয়দেব, উমাপতি এবং কবিরাজ।

সম্ভবত ধোয়ীকে কবিরাজ বলা হয়েছে। কালিদাসের মেঘদূতের অনুকরণে তিনি 'পবনদূত' রচনা করেন। সদুক্তিকর্ণামৃতে উমাপতি ধরের নব্বইটি কবিতার উল্লেখ পাওয়া যায়। বিজয়সেনের দেওপাড়া শিলালিপির প্রশস্তি উমাপতির রচনা। গোবর্ধন 'আর্যসপ্তশতী' কাব্য লিখেছিলেন। গাবর্ধনের পিতা নীলাম্বর ধর্মশাস্ত্রের টীকা লিখেছিলেন। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দের' খ্যাতি বাংলার বাইরেও প্রচারিত হয়েছিল। তাঁর কাব্যে সুর ও ছন্দের সংমিশ্রণ ঘটেছিল।

সেনযুগে ব্রাহ্মণ্যধর্ম রাজ-আনুকূল্য পেলেও অন্যান্য ধর্ম সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত ছিল না। রাজাদের শিলালিপিতে বৈদিক পণ্ডিতদের নাম পাওয়া যায়। এই সময় বৈষ্ণবধর্মেরও প্রসার হয়েছিল। অবশ্য প্রথমদিকের রাজারা শৈব ছিলেন। বল্লালসেন আরাকান, নেপাল ও ভূটানে হিন্দুধর্মপ্রচারক পাঠিয়েছিলেন। মনে হয়, শৈব এবং বৈষ্ণব ছাড়া সূর্যভক্তের সংখ্যাও কম ছিল না।

দক্ষিণ ভারত

পল্লব বংশ

আনুমানিক খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে দক্ষিণ-পূর্ব ভারতে পল্লব-রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীতে পল্লবরাজ সিংহবিষ্ণু কাবেরী পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেছিলেন। তাঁর পুত্র মহেন্দ্রবর্মণ চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর হাতে পরাজিত হয়েছিলেন। মহেন্দ্রবর্মণের পুত্র নরসিংহবর্মণ পুলকেশীকে পরাজিত করে চালুক্য রাজধানী বাদামি অধিকার করেছিলেন। তিনি সিংহলের সিংহাসনে নিজের মনোনীত ব্যক্তিকে বসিয়েছিলেন। অষ্টম শতাব্দীতে পল্লবরাজ্য নেতৃত্বের অভাবে এবং বাইরের আক্রমণে দুর্বল হয়ে পড়ল। চোল, পাণ্ড্য, গঙ্গ এবং রাষ্ট্রকূটদের সঙ্গে তাঁদের দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম চলেছিল। রাষ্ট্র-কূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ পল্লবরাজ দন্তিবর্মণকে পরাজিত করেছিলেন। নবম শতাব্দীর শেষে চোলরাজ প্রথম আদিত্য পল্লবরাজ অপরাজিত বর্মণকে পরাজিত করে পল্লবরাজ্য অধিকার করলেন।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্যশিল্পে পল্লবদের অসাধারণ অবদান ছিল। মহেন্দ্রবর্মণের সময়ে পাথর কুঁদে মন্দিরনির্মাণের রীতি প্রচলিত হয়।

নরসিংহবর্মণের সময়ে মল্লপুরমের বিশাল মন্দির নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরের গায়ে খোদাই করা মূর্তিগুলির মধ্যে সৌন্দর্যের অপূর্ব বিকাশ ঘটেছিল। বিখ্যাত 'সাত প্যাগোডা' তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত হয়েছিল। এর মধ্যে গঙ্গাবতরণের শিল্প-সৌন্দর্য অতুলনীয়। গুহা-মন্দিরও নির্মিত হত। মল্লপুরমে পনেরটি গুহা-মন্দির আছে। পল্লবদের শিল্পরীতি পরে চোলদের প্রভাবিত করেছিল।

কাঞ্চী ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল। 'কিরাতার্জুনীয়ম্' রচয়িতা ভারবি সিংহবিষ্ণুর সভা অলঙ্কৃত করতেন। দণ্ডী অলঙ্কার-শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন।

চালুক্য বংশ

ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রথম পুলকেশী দক্ষিণ ভারতে চালুক্য-রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। বাদামি অথবা বাতাপি শহর চালুক্যদের রাজধানী ছিল। প্রথম কীর্তিবর্মণ এবং মঙ্গলেশ রাজ্যের সীমা প্রসারিত করেন। দ্বিতীয় পুলকেশী (৬০৯-৪২ খ্রীস্টাব্দ) এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন। তিনি দক্ষিণ গুজরাট, মালব, কোঙ্কন ও মহীশূর জয় করেন। চোল, পাণ্ড্য এবং কেরল রাজ্য তাঁর প্রভুত্ব স্বীকার করে। তিনি পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মণকে পরাজিত করেন এবং হর্ষবর্ধনের গতিরোধ করেন। তাঁর রাজসভায় পারস্যের দূত এবং হিউ-এন সাঙ এসেছিলেন। কিন্তু পল্লবরাজ নরসিংহবর্মণের হাতে পুলকেশী পরাজিত ও নিহত হলে চালুক্যশক্তি সাময়িকভাবে বিনষ্ট হয়। পুলকেশীর পুত্র প্রথম বিক্রমাদিত্য পৈতৃক রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। চোল, পাণ্ড্য ও কেরল অঞ্চলের উপর আবার চালুক্য প্রভাব ফিরে আসে। দীর্ঘস্থায়ী চালুক্য-পল্লব সংগ্রাম দুই শক্তিরই পতনের কারণ হল। রাষ্ট্রকূটরাজ দন্তিদুর্গ, চালুক্যরাজ কীর্তিবর্মণকে পরাজিত করলে চালুক্য-গৌরবের অবসান ঘটল।

চালুক্যরা ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী ছিলেন। তবে হিউ-এন সাঙ চালুক্য-রাজ্যে একশ'র বেশি বৌদ্ধ মঠ দেখেছিলেন। ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে পাহাড় খোদাই করে গুহা-মন্দির নির্মাণের নতুন রীতির সূচনা এ সময়েই হয়েছিল। সম্ভবত চালুক্যরা অজন্তার গুহায় কিছু ছবি আঁকার কাজে সহায়তা করেছিলেন।

চোলবংশ ও নৌশক্তি

নবম শতাব্দীতে পল্লবশক্তির অবনতি হলে চোলশক্তি বাড়তে থাকে। প্রথম পরন্তক (৯০৭-৫৩ খ্রীস্টাব্দ) পল্লবরাজ্য বিধ্বস্ত করলেও সিংহল আক্রমণে সাফল্যলাভ করেন নি। প্রথম রাজরাজ (৯৮৫-১০১৬ খ্রীস্টাব্দ) সমুদ্র অতিক্রম করে সিংহলের উত্তরাংশ দখল করে-ছিলেন। তাঁর নৌবাহিনী ভারত মহাসাগরের বহু দ্বীপ অধিকার করেছিল। বলা হয়েছে, সমুদ্রের ১২০০ দ্বীপ তাঁর শাসনাধীন ছিল। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা প্রথম রাজেন্দ্র চোল (১০১৬-৪৪ খ্রীস্টাব্দ) সমগ্র সিংহল দখল করলেন। তাঁর শক্তিশালী নৌ-বাহিনী বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করে আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, ব্রহ্মদেশের পেগুপ্রদেশ এবং সুমাত্রা ও মালয়ের কিছু অংশ অধিকার করেছিল। ভারতের আর কোনও রাজা নৌশক্তিতে এতটা সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর পুত্র প্রথম রাজাধিরাজ চোল-গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখতে পারেন নি। সম্ভবত তাঁর আমলে রাজেন্দ্র চোল-কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সামুদ্রিক সাম্রাজ্যে ভাঙ্গন ধরে। দ্বিতীয় রাজেন্দ্র অথবা প্রথম কুলোত্তুঙ্গ (১০৭২-১১২২ খ্রীস্টাব্দ) এইজন্যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন, কারণ সমুদ্রের ওপারের প্রদেশগুলি সম্ভবত চোল শাসন মানতে অস্বীকার করে। এর পর পাণ্ড্যদের আক্রমণে চোলরাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ল। চতুর্দশ শতাব্দীতে আলাউদ্দিন খলজীর সেনাপতি মালিক কাফুর চোলরাজ্য জয় করেছিলেন।

দক্ষিণ ভারতের মন্দির

ত্রয়োদশ অধ্যায়
ভারত ও বহির্বিশ্ব

ভারতের উত্তরে দুর্গম হিমালয় পর্বতমালা এবং তিনদিকে সমুদ্র থাকা সত্ত্বেও প্রাচীনকাল থেকেই প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিল। স্থলপথে ও জলপথে ভারতীয় বণিক, ধর্মপ্রচারক ও পরিব্রাজকরা বিভিন্ন দেশে যাতায়াত করতেন। এই সকল দেশে ভারতীয় সংস্কৃতির বহু নিদর্শন আজও পাওয়া যায়।

মধ্য-এশিয়া

বিখ্যাত পণ্ডিত স্টাইন মধ্য-এশিয়াতে ভারতীয় সভ্যতার অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেছেন। বাণিজ্য ও বৌদ্ধধর্মের

বহির্বিশ্বে ভারতের উপনিবেশ

মাধ্যমে মধ্য-এশিয়ার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। কুষাণযুগে এই সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। কুষাণবংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কণিষ্ক মহাযান বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই সময়ে মহাযান মত মধ্য-এশিয়াতে প্রসারলাভ করেছিল। পরবর্তী কালেও মধ্য-

এশিয়ার যাযাবর জাতিরা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিল। কাশগড়, খোটান, কুচি প্রভৃতি জায়গায় ভারতীয় উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। বিশেষ করে খোটানের ভারতীয় উপনিবেশ অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। বৌদ্ধস্তূপ ও মঠের ধ্বংসাবশেষ, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের দেবদেবীর মূর্তি এবং ভারতীয় ভাষায় ও অক্ষরে লেখা অনেক পাণ্ডুলিপি মধ্য-এশিয়াতে পাওয়া গিয়াছে। ফা-হিয়েন এবং হিউ-এন সাঙ এই অঞ্চলের জীবন-যাত্রার উপর বৌদ্ধধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। দুর্ধর্ষ যাযাবররা বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে অনেক শান্ত হয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলির একটা বড় অংশ গোবি মরুভূমির তলায় চাপা পড়ে গিয়েছে। স্টাইন লিখেছেন যে, খননকার্যের ফলে আবিষ্কৃত শহরের মধ্য দিয়ে চলাফেরা করবার সময় তাঁর মনে হয়েছে, তিনি যেন ভারতীয় শহরেই আছেন। অনেক ঐতিহাসিকের মতে, মধ্য-এশিয়া থেকে চীন, কোরিয়া ও জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রবেশ করেছিল।

চীন : বৌদ্ধধর্ম চীন ও ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্কের সূচনা করেছিল। কিংবদন্তী অনুসারে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কাশ্যপ মাতঙ্গ চীনের সম্রাটের আমন্ত্রণে চীনে গিয়েছিলেন। পঞ্চম শতাব্দীর পর থেকে চীনে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার হয়। তারপর থেকে ফা-হিয়েন, হিউ-এন সাঙ, ইৎ-সিঙ প্রভৃতি চৈনিক পরিব্রাজক ভারতে আসেন। অপরদিকে বহু ভারতীয় পণ্ডিত চীনে যান। ভারতীয় চিকিৎসা-বিদ্যা, গণিত ও সঙ্গীত চীনে সমাদৃত হয়েছিল। চীনের ভাস্কর্য ও চিত্রা-অঙ্কনরীতিতে ভারতীয় প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। চীনদেশের প্রাচীর-চিত্রে ভারতীয় প্রভাব আছে। ভারত ও চীনের মধ্যে রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্বন্ধ ছিল।

তিব্বত : প্রধানত বৌদ্ধধর্মের মাধ্যমে ভারতের সঙ্গে তিব্বতের সম্পর্ক স্থাপিত। সপ্তম শতাব্দীতে তিব্বতরাজ স্রং-সান-গ্যাম্পো তাঁর নেপালী ও চীনা মহিষীদের প্রভাবে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের প্রচলন করলেন। খোটানে যে-ভারতীয় লিপি প্রচলিত ছিল, সেই লিপি তিনি তিব্বতে চালু করেছিলেন। এর আগে কোন তিব্বতী লিপি বা বর্ণমালা ছিল না। বহু তিব্বতী শিক্ষার্থী ভারতের

নালন্দা, বিক্রমশীলা, সোমপুরী প্রভৃতি বিহারে অধ্যয়ন করতে আসতেন। তাঁরা বহু সংস্কৃত গ্রন্থ তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করেন। তাঞ্জুর ও কাঞ্জুর নামক তিব্বতী সংগ্রহে বহু বৌদ্ধগ্রন্থের ও গ্রন্থকারের নাম পাওয়া যায়। ৯৮০ খ্রীস্টাব্দে তিব্বতের রাজা যোশী হড় ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও উত্তরাধিকারী চেন চাবের একান্ত অনুরোধে ভারতীয় পণ্ডিত দীপঙ্কর ধর্মপ্রচার ও জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেবার জন্য তিব্বতে গিয়েছিলেন। এর পূর্বে তিনি সুবর্ণদ্বীপে বার বৎসর মহাপণ্ডিত চন্দ্রকীর্তির কাছে অধ্যয়ন করেন এবং সিংহল ভ্রমণ করে মগধে যান। ষাট বৎসর বয়সে অত্যন্ত দুর্গম পথ অতিক্রম করে তিনি তিব্বতে প্রবেশ করেছিলেন। জনৈক তিব্বতী সন্ন্যাসী তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। অতীশ দীপঙ্কর তিব্বতী বৌদ্ধধর্মকে অনাচারমুক্ত করেছিলেন এবং তিব্বতে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। তিনি মধ্যমক রত্নপ্রদীপ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন এবং মহাযান মত ব্যাখ্যা করে কয়েকটি বই লিখেছিলেন। সম্ভবত সত্তর অথবা তিয়াত্তর বৎসর বয়সে তিব্বতে তাঁর মৃত্যু হয়। আজও তিব্বতে তাঁকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা করা হয়।

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অথবা সুবর্ণভূমির দেশগুলির সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ হয়েছিল জলপথে। সমুদ্রযাত্রার বিপদ তুচ্ছ করে ভারতীয়রা এই সব দেশে পাড়ি দিত। ভারতীয় বণিকরা বাণিজ্য-প্রসারে আগ্রহী ছিল। তা ছাড়া, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ প্রচারকদের উৎসাহ ও ক্ষত্রিয় যুবকদের অভিযানের স্পৃহা এর মূলে ছিল। এর ফলে, বহু ভারতীয় এই সব দেশে স্থায়িভাবে বসবাস করতে শুরু করে। তা ছাড়া, অনেক ভারতীয় রাজা যুদ্ধ করে এখানে রাজ্যস্থাপন করেন। এইভাবে এই সব অঞ্চলে ভারতীয় সভ্যতা, ধর্ম, রীতিনীতি এমনভাবে বিস্তারলাভ করল যে, এই অঞ্চলে বৃহত্তর ভারত নামে পরিচিতি লাভ করল। জাতক ও কথাসরিৎসাগরে আমরা ভাগ্যবিড়ম্বিত বহু ভারতীয় রাজপুত্র বা বণিকের সুবর্ণদ্বীপে যাত্রার কথা শুনি। চীনের ঐতিহাসিকরা এই সব রাজ্যের কথা লিখেছেন।

কম্বোজ কম্বোডিয়ার দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত ছিল। কম্বোজের

প্রাচীন হিন্দু রাজ্যের নাম ছিল ফু-নান। প্রাচীন রাজধানীর নাম ছিল যশোধরপুর। কথিত আছে যে, কৌণ্ডিল্য নামে এক ব্রাহ্মণ কম্বোজরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। আবার অনেকের মতে, জনৈক ভারতীয় সন্ন্যাসী কম্ব এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। এই হিন্দুরাজ্যে বহু ব্রাহ্মণ বাস করতেন ও শাস্ত্র অধ্যয়ন করতেন। রাজধানী অঙ্কোরবাত সুপরিকল্পিত ও সুন্দর ছিল। পাঁচটি দরজাবিশিষ্ট প্রাচীর দিয়ে নগরটি বেষ্টিত ছিল। প্রশস্ত রাজপথে বিশাল তোরণ ও স্তম্ভ ছিল। হ্রদে নৌকা-বিহারের ব্যবস্থা ছিল। বিষ্ণু ও শিবের পূজা হত। মন্দিরের সঙ্গে চিকিৎসালয় ছিল। নগরটি জনবহুল ছিল। নগরের কেন্দ্রস্থলে বিখ্যাত শিবের মন্দির পিরামিডের আকারে নির্মিত হয়েছিল। এর প্রায় চল্লিশটি গম্বুজের প্রতিটির শীর্ষদেশে ধ্যানরত শিবমূর্তি আছে।
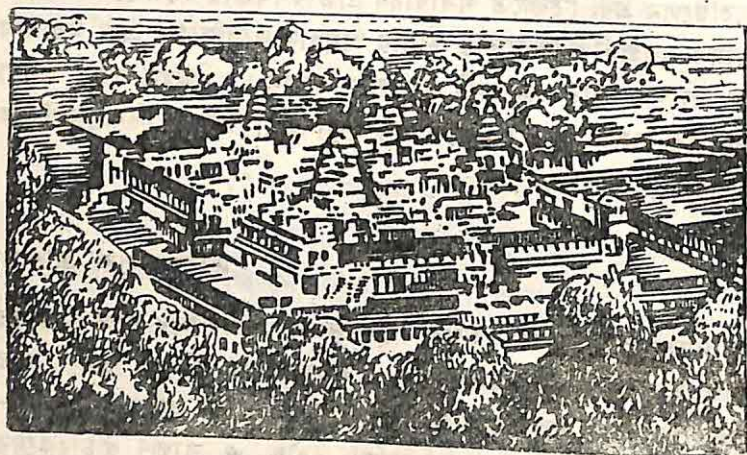
অঙ্কোরবাত

কম্বোজসম্রাট সূর্যবর্মণের নির্মিত অঙ্কোরবাতের বিষ্ণুমন্দির আয়তনে বিশাল এবং সৌন্দর্যে অনুপম ছিল। এই মন্দির অনেকগুলি অংশে বিভক্ত ছিল। মন্দিরের প্রাচীরগাত্রে শিব, যম প্রভৃতির মূর্তি এবং রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী খোদিত আছে। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে আনাম ও থাইজাতির আক্রমণে এই রাজ্যটি ধ্বংস হয়ে যায়।

বর্তমান আনাম দেশের এক অংশে চম্পা নামে একটি হিন্দু রাজ্য ছিল। কথিত আছে যে, বিহারের চম্পা থেকে আগত একদল বণিক

এই রাজ্যটি প্রতিষ্ঠা করে। চম্পার অধিবাসীরা যুদ্ধে পারদর্শী ছিল। তারা চীনের কুবলাই খানের আক্রমণ বীরত্বের সঙ্গে প্রতিহত করেছিল। বহু প্রাচীন বৌদ্ধ ও হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির পরিচয় বহন করছে। ষোড়শ শতাব্দীতে মোঙ্গলদের বারংবার আক্রমণে এই রাজ্য ধ্বংস হয়েছিল।

খ্রীস্টীয় অষ্টম শতকে মালয় উপদ্বীপ, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলি, বোর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপ নিয়ে শৈলেন্দ্রবংশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। আরব বণিকদের বর্ণনা-অনুযায়ী এই সাম্রাজ্য পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ ছিল। একজন আরব বণিক লিখেছেন যে, মহারাজার দৈনিক আয় ছিল দু'শ মণ সোনা। রাজাদের অতি শক্তিশালী নৌবহর ছিল। তাঁরা দক্ষিণ ভারতের চোল রাজাদের সঙ্গে প্রায়ই নৌ-যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকতেন। তাঁরা মহাযানী বৌদ্ধ ছিলেন। কুমার ঘোষ বলে একজন বাঙালী শৈলেন্দ্রবংশের রাজগুরু ছিলেন। তাঁর নির্দেশে তারা দেবীর একটি মন্দির এখানে নির্মিত হয়েছিল। শৈলেন্দ্ররাজ বালপুত্রদেব পাল সম্রাট দেবপালের অনুমতি নিয়ে নালান্দায় একটি মঠ নির্মাণ করেন। বালপুত্রদেবের অনুরোধে দেবপাল পাঁচটি গ্রাম ঐ মঠের খরচনির্বাহের জন্য দান করেন। শৈলেন্দ্রবংশের স্থাপত্যকীর্তি কত উন্নত ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় বোরোবুদুরের বৌদ্ধ স্তূপটি দেখে। যবদ্বীপে একটি পাহাড়ের
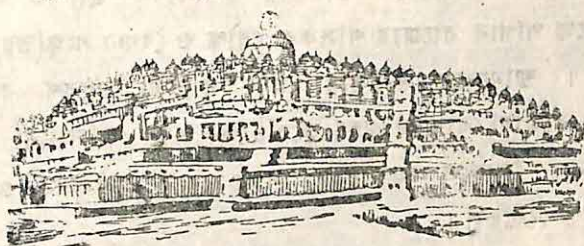
বোরোবুদুর

উপর নির্মিত মন্দিরটি ন'টি স্তরে বিভক্ত। এগুলি থাকে থাকে উপরে উঠেছে। প্রতিটি স্তরে সুন্দর বুদ্ধমূর্তি আছে। সবচেয়ে উপরের স্তরে ঘণ্টার আকারে একটি স্তূপ আছে। জাতকের বিভিন্ন কাহিনী দেওয়ালের গায়ে খোদিত আছে। মন্দিরের নির্মাণকৌশল ও পরিকল্পনা অসাধারণ।

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে যবদ্বীপে একটি হিন্দুরাজ্য গড়ে উঠেছিল। পরে শৈলেন্দ্র রাজারা এই রাজ্য জয় করেছিলেন। কিন্তু একাদশ শতাব্দীতে শৈলেন্দ্রবংশের পতনের পর শ্রীবিজয় এখানে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল তিক্তবিল্ব। চৈনিক পরিব্রাজক ইৎ-সিঙ এটিকে একটি বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র বলে অভিহিত করেছেন। এখানে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মেরই প্রচলন ছিল। যবদ্বীপে বহু সংস্কৃত পুথি পাওয়া গিয়েছে। রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প নিয়ে এখানে ছায়ানাট্য অনুষ্ঠিত হত।

সুমাত্রার প্রাচীনতম হিন্দুরাজ্য শ্রীবিজয় সপ্তম শতাব্দীর শেষদিকে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। সুমাত্রার আর একটি হিন্দু রাজ্যের নাম ছিল মলয়ু। মার্কোপোলোর কাহিনীতে এই রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। মালয়ে হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এবং সংস্কৃত-ভাষায় প্রাচীন শিলালিপি পাওয়া যায়। চতুর্থ খ্রীস্টাব্দে বোর্ণিওতে হিন্দু উপনিবেশ ছিল। ব্রাহ্মণ্যধর্ম ছিল সেখানকার প্রধান ধর্ম এবং ব্রাহ্মণরা জনসংখ্যার উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল। বলিদ্বীপে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধ ও শৈবধর্মও প্রচলিত ছিল। মালয়ে কয়েকটি হিন্দু উপনিবেশ ছিল। এখানে বৌদ্ধ ও হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ এবং সংস্কৃতভাষায় রচিত শিলালিপি পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক থেকেই সম্ভবত ব্রহ্মদেশে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল। মধ্য-ব্রহ্মে পাগান রাজ্যের শাসকরা বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সংস্কৃতির অনুরাগী ছিলেন। শ্যামদেশে ভারতীয় ধর্ম ও সাহিত্য প্রবেশ করেছিল। শ্যামের রাজারা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং পালিভাষা ব্যবহার করতেন। সিংহলে অশোকের সময় থেকে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি প্রচারিত হয়েছিল।

পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে শান্তিপূর্ণভাবে ভারতীয় সংস্কৃতি প্রসার-লাভ করেছিল। হিন্দু উপনিবেশগুলিতে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত ছিল। যবদ্বীপে বৌদ্ধ ও শৈবধর্মীয়দের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। রামায়ণ ছিল যবদ্বীপের সাহিত্যের প্রধানতম স্তম্ভ। হিন্দু উপ-নিবেশগুলিতে সামাজিক জীবন ভারতীয় প্রভাবে গড়ে উঠেছিল। যবদ্বীপ ও সুমাত্রায় জাতিভেদপ্রথা সুপ্রচলিত ছিল। তবে বিভিন্ন

জাতির মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না এবং অস্পৃশ্যতা প্রচলিত ছিল না। চম্পার হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য ছিল এবং সংস্কৃত ছিল সরকারী ভাষা। ইন্দ্রবর্মণ নামে চম্পার এক রাজা হিন্দু দর্শনের ছয়টি বিভাগ, বৌদ্ধ দর্শন, সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রভৃতি সযত্নে অধ্যয়ন করেছিলেন। কম্বোজে ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃত ভাষার চর্চা হত। জাতিভেদপ্রথার প্রচলন ছিল। সংস্কৃত ভাষায় রচিত শিলালিপি-গুলিতে উন্নত কাব্যছন্দের নিদর্শন পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হলেও এই সব রাজ্যে ভারতীয় সংস্কৃতি স্থানীয় সংস্কৃতিকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল।

চতুর্দশ অধ্যায়
সুলতানী আমল
মুসলমানদের আগমন ও রাজ্যপ্রতিষ্ঠা

দ্বাদশ শতাব্দীতে মহম্মদ ঘোরী ভারত আক্রমণ করে মুসলমান সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্থাপন করেন। এর আগেই দশম শতকে আরবরা মহম্মদ-বিন-কাশিমের নেতৃত্বে সিন্ধু অঞ্চল দখল করেছিল। দশম খ্রীস্টাব্দে গজনীর তুর্কী মুসলমান রাজা সবুক্তগীন ভারত আক্রমণ করেন। তাঁর পুত্র সুলতান মামুদ ১০০১ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১০১৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে সতেরবার ভারত আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। লুণ্ঠন ছাড়া অমুসলমান ভারতীয়দের বিরুদ্ধে 'জিহাদ' বা ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা মামুদের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে ঘোর রাজ্যের সুলতান মহম্মদ ঘোরী প্রধানত রাজ্যবিস্তারের উদ্দেশ্যে ভারত আক্রমণ করেন। ১১৯২ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় তরাইনের যুদ্ধে তিনি পৃথ্বীরাজকে পরাজিত ও নিহত করেন। মহম্মদ ঘোরী কুতুবউদ্দীন আইবক নামক সেনাপতিকে বিজিত অঞ্চলের শাসনকর্তার পদে নিয়োগ করেন। ১২০৬ খ্রীস্টাব্দে কুতুবউদ্দীন দিল্লীর প্রথম মুসলমান সুলতান হলেন। কুতুবউদ্দীনের (১২০৬ খ্রীঃ) প্রতিষ্ঠিত বংশই তথাকথিত দাস বংশ।

বিভিন্ন সুলতানী বংশ

এই বংশের অন্যতম দক্ষ শাসক ইলতুৎমিস (১২১১-১২৩৬ খ্রীঃ) সুলতানী শাসনের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেন ও মোঙ্গল চেঙ্গিস খানের আক্রমণের হাত থেকে ভারতকে রক্ষা করেন। দাসবংশের অন্যতম দক্ষ সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবন (১২৬৬-৮৭ খ্রীঃ) উদ্ধত আমীরদের দমন করেন ও সেনাবাহিনীকে সংগঠিত করেন। খলজী-বংশের সর্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত সুলতান আলাউদ্দীন খলজী (১২৯৬-১৩১৬ খ্রীঃ) সমগ্র আর্যাবর্ত নিজের অধীনে এনে দাক্ষিণাত্যও জয় করেন। খলজী বংশের পতনের পর দিল্লীর মসনদ অধিকার করে তুঘলক বংশ (১৩২০ খ্রীঃ)। এই বংশের বিখ্যাত সুলতান মহম্মদ-বিন্ তুঘলকের (১৩২৫-১৩৫১ খ্রীঃ) চরিত্রে দৃঢ়তা ও পাণ্ডিত্যের এক বিচিত্র সমন্বয় দেখা যায়। দাক্ষিণাত্যের দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করে তিনি জনসাধারণের দুর্দশার কারণ হয়েছিলেন। তাঁর তামার মুদ্রার পরিকল্পনাও ব্যর্থ হয়। তাঁর শাসনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মোঙ্গলরা ভারত আক্রমণে উৎসাহিত হল এবং রাজ্যের নানা জায়গায় বিদ্রোহ দেখা দিল। কিছুটা শান্তি ও শৃঙ্খলা আনলেও কিছুদিনের মধ্যে তাঁর সাম্রাজ্য ভেঙ্গে গেল। তৈমুরলঙ্গ

আলাউদ্দিন খলজী

মহম্মদ-বিন্ তুঘলক

এই সময় ভারত লুণ্ঠন করেন। ১৫২৬ খ্রীস্টাব্দে প্রথম পানিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদী বাবরের নেতৃত্বে মোগলদের হাতে পরাজিত ও নিহত হলে সুলতানী শাসনের অবসান হয়।

সুলতানী আমলের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য এবং হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক

প্রথম দিকে বিজিত ও বিজেতার সম্পর্ক হিন্দু-মুসলমানের মিলনের অন্তরায় ছিল। মুসলমানদের কবল থেকে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করবার তাগিদে হিন্দু সমাজে বহু কঠোর নিয়ম প্রচলিত হয়েছিল। পরবর্তী কালে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের ফলে মিলনের সূত্রপাত হয়েছিল। হিন্দুরা উচ্চপদে নিযুক্ত হতে লাগল। অনেক মুসলমান হিন্দু বিবাহ করে হিন্দুদের রীতিনীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। হিন্দুরাও মুসলমানদের ভাষা ও পোশাক-পরিচ্ছদের অনুকরণ করত।

মধ্যযুগে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত ভারতেও অভিজাতশ্রেণীরই প্রাধান্য ছিল। তাদের পরবর্তী শ্রেণীতে ছিল ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, সর্বনিম্নস্তরে অবস্থিত কৃষক ও শ্রমিকদের অবস্থা ছিল শোচনীয়।

কৃষিকার্য ছিল প্রধান উপজীবিকা, তবে পশুপালনও প্রচলিত ছিল। শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হয়েছিল। আমীর খসরু বলেছেন, রাজমুকুটের এক-একটি মুক্তার জন্ম কৃষকের অশ্রু থেকে।

সাংস্কৃতিক সমন্বয় ও ভক্তিবাদ

হিন্দু-মুসলমান সাংস্কৃতিক সমন্বয় ভক্তিবাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ফুটে উঠেছিল। এই যুগে বহু হিন্দু ও মুসলমান ধর্মগুরুর আবির্ভাব হয়। তাঁরা বলতেন যে, ঈশ্বর এক। যেহেতু সকল মানুষই তাঁর সন্তান, সুতরাং সকলেই সমান।

কবীর

বিখ্যাত সন্ত কবীর প্রথম জীবনে মুসলমান ছিলেন। পরে রামানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তিনি হিন্দিভাষায় ধর্মপ্রচার করেন। তিনি বলতেন, রাম ও আল্লা একই ঈশ্বর। হিন্দু ও

মুসলমান একই মাটির দুটি পাত্র। তিনি বলতেন, ঈশ্বর আছেন ভক্তের প্রেমে, পাণ্ডিত্যে বা শাস্ত্রে নয়। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল।

নানক (১৪৬৯-১৫৩৮খ্রীঃ) লাহোরের তালবন্দীগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বলতেন, ভক্তিভরে ডাকলে ও মানব-সেবা করলে ঈশ্বরকে লাভ করা যায়। নানকের উপদেশ অবলম্বন করে শিখ ধর্মগ্রন্থ "আদিগ্রন্থ' রচিত হয়।

নানক

শ্রীচৈতন্য

শ্রীচৈতন্য (১৪৮৫-১৫৩৩ খ্রীস্টাব্দ) বাংলার নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি গভীর প্রেমই মানুষকে মুক্তি এনে দেবে, এই ছিল তাঁর ধর্মের মূলকথা। শ্রীচৈতন্য জাতিভেদ, যাগ-যজ্ঞ-অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি মানতেন না। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই তাঁর শিষ্য ছিল। যবন হরিদাস তাঁর শিষ্য ছিলেন, তিনি ছিলেন মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ।

এই যুগের শিল্পরীতিতে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। কুতুবমিনার, আলাই দরওয়াজা, নিজামউদ্দিন আউলিয়ার দরগা প্রভৃতি এ যুগের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। গিয়াসউদ্দিন
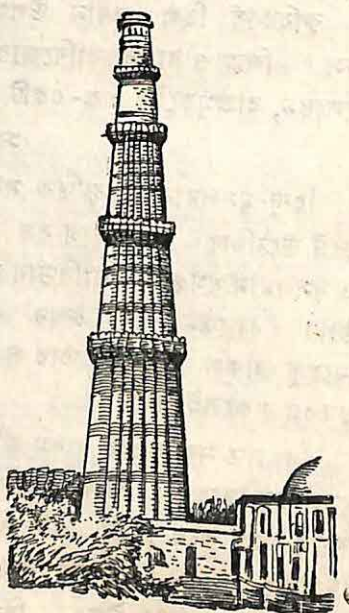
কুতুবমিনার

তুঘলকের আমলে তুঘলকাবাদ শহর তৈরি হয়েছিল। সুলতান এবং মুসলমান আমীরগণ ইসলামের ঐতিহ্য অনুযায়ী সারাসেনীয় রীতির পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু হিন্দু স্থপতিরা ভারতীয় রীতি অনুসরণ করতে চাইতেন। ফলে, মিশ্র স্থাপত্যরীতি বা ভারতীয় সারাসেনীয় শিল্পকলার বিকাশ ঘটেছিল। গুজরাট, মাণ্ডু এবং জৌনপুরের শিল্পে যথেষ্ট ভারতীয় প্রভাব দেখা যায়।

সুলতানদের মধ্যে অনেকে আরবী, ফারসী এবং সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। ফিরোজ তুঘলকের আদেশে নগরকোটের জ্বালামুখী মন্দিরের তিনশ' সংস্কৃত বই ফারসীভাষায় অনূদিত হয়। সিকন্দর লোদীও কিছু বই ফারসীতে অনুবাদ করান। মালিক মহম্মদ জয়সীর পদ্মাবৎ কাব্য মুসলমান-রচিত সংস্কৃত কাব্যের একটি উদাহরণ। প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় স্থানীয় ভাষাগুলির উন্নতি হয়। মৈথিলী ভাষায় রচিত বিদ্যাপতির পদাবলী, রামানন্দ ও কবীরের হিন্দি দোঁহা, মারাঠি ভাষায় নামদেবের গান বা ব্রজবুলিভাষায় মীরাবাঈ-এর ভজন এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বিখ্যাত হিন্দি কবি আমীর খসরুর কাব্যে সাংস্কৃতিক মিলনের সুর পাওয়া যায়।

বাংলায় সুলতানী আমল: বাংলায় সুলতানদের শাসনকালে সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনেক পরিবর্তন হয়েছিল। বাংলার স্নিগ্ধ পরিবেশ তুর্কীদের প্রভাবিত করেছিল। ধর্মান্তরিত মুসলমানরা হিন্দু রীতিনীতি মুসলমান সমাজে নিয়ে আসে। হিন্দুরা সরকারী কাজের প্রয়োজনে মুসলমানদের ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চা শুরু করে। এই আদান-প্রদান সাহিত্য এবং শিল্পেও দেখা যায়। উভয় সম্প্রদায় পীর ও ফকিরদের শ্রদ্ধা করত। ইলিয়াস শাহ (১৩৩৯-৫৯ খ্রীস্টাব্দ) স্বাধীন সুলতান ছিলেন। তিনি ও তাঁর বংশধররা সাহিত্য ও শিল্পের অনুরাগী ছিলেন। তাঁদের ধর্মমত ছিল উদার। রুকনউদ্দীন বারবক শাহের আমলে (১৪৫৯-৭৪ খ্রীস্টাব্দ) মালাধর বসু 'শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়' লিখেছিলেন। বাংলা রামায়ণের রচয়িতা কৃত্তিবাস সম্ভবত রুকনউদ্দীনের আনুকূল্য পেয়েছিলেন। স্থাপত্যশিল্পে পাথরের অভাবে ইটের প্রচলন ছিল। ইলিয়াসের ছেলে সিকান্দার শাহের (আনুমানিক ১৩৫৮-১৩৯১ খ্রীস্টাব্দ) আমলে পাণ্ডুয়ার আদিনা

মসজিদ তৈরি হয়। সামস্ উদ্দীন ইউসুফ শাহের (১৪৭৪-৮১ খ্রীস্টাব্দ) আমলে জামি মসজিদ তৈরি হয়।
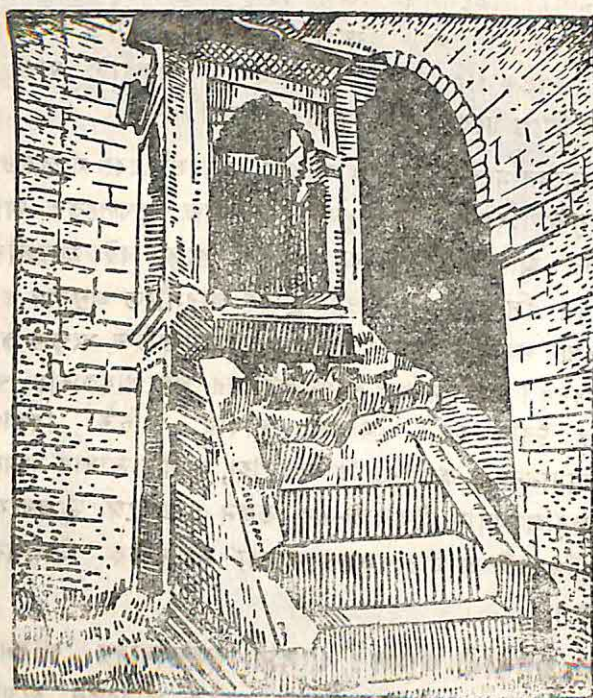
আদিনা মসজিদ

আলাউদ্দীন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীস্টাব্দ) গোপীনাথ বসু, মুকুন্দ দাস, কেশব ছত্রী এবং অনুপ প্রমুখ হিন্দুদের উচ্চপদে নিযুক্ত করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য তাঁর সমসাময়িক ছিলেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে মালাধর বসু, বিপ্রদাস, বিজয় গুপ্ত এবং যশোরাজ খাঁ তাঁর আনুকূল্য পেয়েছিলেন। তাঁর সময়ে শিল্পী ওয়ালি মহম্মদ ছোট সোনা
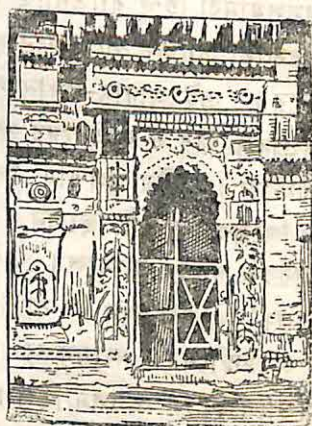
ছোট সোনা মসজিদ

মসজিদ তৈরি করেছিলেন। হোসেন শাহের ছেলে নসরৎ শাহ (১৫১৯-৩২ খ্রীস্টাব্দ) মহাভারতের বাংলা অনুবাদে অগ্রণী হয়েছিলেন। তাঁর কর্মচারী ছুটি খাঁর উৎসাহে শ্রীকর নন্দী মহাভারত অনুবাদ করেন। তাঁর আর এক কর্মচারী কবিরঞ্জন সুকবি ছিলেন। নসরৎ শাহের আমলে গৌড়ের বড় সোনা মসজিদ (১৫২৬ খ্রীস্টাব্দ) স্থাপত্য-শিল্পের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।
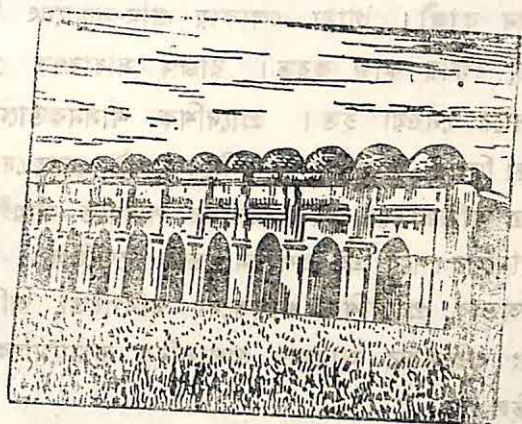
বড় সোনা মসজিদ

এই যুগে সুশাসনের জন্য অর্থনৈতিক উন্নতি হয়েছিল। কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি হয়েছিল। কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত ছিল। সংখ্যায় কৃষকরা ছিল সবচেয়ে বড় সম্প্রদায়। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বেশি ছিল না। তবে খাজনা দেওয়া ও অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা সাধারণ মানুষের পক্ষে সহজ ছিল না। এই সময়ের সাহিত্যে আভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্যের উল্লেখ আছে। ধনী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে যথেষ্ট বৈষম্য ছিল।

সুলতানী প্রশাসন

সুলতানী আমলে ভারত ইসলাম-ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। তবে আলাউদ্দীন খলজী বা মহম্মদ-বিন-তুঘলকের মত কয়েকজন

শাসক রাজ্যশাসনে ধর্মের নির্দেশ মানতেন না। সুলতানরা সামরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল ছিলেন। সুলতানই একাধারে শাসক, সেনাপতি, আইনপ্রণেতা ও বিচারক ছিলেন। অভিজাতদের অধঃপতন অনেক ক্ষেত্রে তাদের ও রাজ্যের বিপদ ডেকে আনত। সুলতানকে সাহায্য করত মজলিস-ই-খালওয়াত নামে একটি পরিষদ। রাজ-কর্মচারীদের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। বিচার বিভাগের প্রধান ছিলেন কাজী। গ্রাম্য এলাকায় গ্রাম-পঞ্চায়েৎ বিচার ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজ করত। রাজস্ব সাধারণত কোরানের নিয়ম অনুসারে নেওয়া হত। প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের হাতে অনেক ক্ষমতা ছিল। সামরিক বাহিনীকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হত। অনেক ক্ষেত্রে অভিজাতরা নগদ বেতনের পরিবর্তে জায়গীর পেত। সুলতানী আমলের শেষে এই প্রশাসন ভেঙ্গে পড়েছিল। শক্তিশালী সুলতানের অভাব, প্রাদেশিক শাসকদের স্বার্থপরতা, অভিজাতদের উচ্চাশা এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রশাসনিক কাঠামোকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল।

পঞ্চদশ অধ্যায়

মধ্যযুগের অবসান ও আধুনিক যুগের সূচনা

খ্রীস্টীয় চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে নানারূপ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মধ্য-যুগের অবসান ও আধুনিক যুগের সূচনা হতে থাকে। ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, শহরের উৎপত্তি, মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিকাশ এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলন সামন্ত-সমাজে পরিবর্তন আনে। ১৪৫৩ খ্রীস্টাব্দে তুর্কী আক্রমণে কনস্টান্টিনোপল তথা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের পতন মধ্যযুগের অবসানকে সম্পূর্ণ করল। আভ্যন্তরাণ ক্ষেত্রেও পূর্ব-রোমান সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়েছিল। মুসলমানদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য বহু পণ্ডিত তাঁদের পুথিপত্র নিয়ে ইউরোপের নানাদেশে, প্রধানত, ইটালীতে আশ্রয় নিলেন। এর ফলে প্রাচীন গ্রীস বা রোমের যে

কনস্টান্টিনোপলের পতন

বিদ্যাচর্চা কনস্টান্টিনোপলে সীমাবদ্ধ ছিল তা সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ল।

গ্রীক ও রোমক জ্ঞানের চর্চা ও প্রসারকে নবজাগরণ বা রেনেসাঁস বলা হয়। যাঁরা গ্রীক ও রোমে সাংস্কৃতিক চর্চা করতেন, তাঁদের বলা হত হিউম্যানিস্ট অথবা মানবতাবাদী। হিউ-ম্যানিস্টরা ধর্মমত নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে যে-সব বিদ্যার চর্চা করলে জীবনে সাফল্য আসবে তার অনুশীলন করতেন। শিল্প ও সাহিত্যে ধর্ম অপেক্ষা মানুষকে বেশি প্রাধান্য দেবার জন্য তাঁদের হিউম্যানিস্ট বলা হত। মুদ্রণ-যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে এই সংস্কৃতি দ্রুত প্রসারলাভ করে।

মানবতাবাদ

রেনেসাঁসের প্রভাবে প্রাচীন বিধি-নিষেধগুলিকে অন্ধের মত না মেনে মানুষ যুক্তি ও বিচারবুদ্ধির সাহায্যে তাদের সত্যতা বিচারের সাহস পেল। এই সময়ে আধুনিক বিজ্ঞানের সূচনা হল। মানুষ প্রচলিত বিশ্বাসের উপর নির্ভর না করে পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রাকৃতিক নিয়মাবলীকে জানল ও সেগুলিকে কাজে লাগাতে শুরু করল।

যুক্তি ও বিজ্ঞান

ভৌগোলিক আবিষ্কার ও তার ফল

মানুষ অজানা দেশকে জানতে চাইল। বাণিজ্যপ্রসারের আশায়ও মানুষ নতুন দেশ আবিষ্কারের প্রেরণা লাভ করল। ভাস্কো-ডা-গামা জলপথে ভারতে এলেন এবং কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করলেন। ভূমধ্যসাগরের প্রাধান্য কমে গেল। সেই সঙ্গে ভেনিসের প্রতিপত্তির অবসান হল। স্পেন, পর্তুগাল প্রভৃতি আটলান্টিক তীরবর্তী দেশের গৌরবময় সূচনা হল। ইউরোপীয় বণিকরা ব্যবসার নামে এশিয়া ও আফ্রিকার অধিবাসীদের শোষণ করতে লাগল। পশ্চিম ইউরোপের ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি রাজ্যে পুরাতন অভিজাতদের জায়গায় বণিকদের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেল। উপনিবেশ-স্থাপন ও বাণিজ্যপ্রসারের জন্য ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হল।

পোপ ও সম্রাটের আধিপত্য শেষ হল। রাজারা নিজের নিজের রাজ্যে সর্বেসর্বা হয়ে বসলেন। রাজা সামন্তদের বিরুদ্ধে বণিকদের সমর্থন পেতেন। এই রাজতন্ত্রকে নতুন রাজতন্ত্র বলা হয়েছে। এই রাজতন্ত্র জাতীয়তাবাদী মনোভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, পর্তুগাল ও স্পেনে এই রাজতন্ত্রের বিকাশ ঘটেছিল। ইংল্যাণ্ডে টিউডর বংশ এবং ফ্রান্সে বুরবোঁ বংশ শক্তিশালী ছিল। ফার্ডিনাণ্ড, ইসাবেলা এবং দ্বিতীয় ফিলিপ স্পেনকে অগ্রগতির পথে নিয়ে গিয়েছিলেন। পরাধীন দেশগুলিতে জাতীয় রাজ্য গড়ার সংগ্রাম শুরু হয়। নেদারল্যাণ্ড স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং অবশেষে স্বাধীন ডাচ প্রজাতন্ত্রের জন্ম হয়।

নতুন রাজতন্ত্র

ক্রমশ শক্তিশালী ও স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিভিন্ন দেশে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ইংল্যাণ্ডের রাজার সঙ্গে পার্লামেণ্টের বিরোধ চরম পর্যায়ে পৌঁছে। এর ফলে স্টুয়ার্ট রাজা প্রথম চার্লসের আমলে গৃহযুদ্ধ হয়। ক্রমে রাজতন্ত্রের জায়গায় একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেও কিছুকাল পরেই রাজতন্ত্র ফিরে আসে। ধীরে ধীরে রাজার ক্ষমতা কমতে থাকে এবং পার্লামেণ্টের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।

রাজতন্ত্র ও পার্লামেন্ট

———

অনুশীলনী

প্রথম অধ্যায়

১। ইউরোপে মধ্যযুগের সূচনা কি ভাবে হয়েছিল?

২। মধ্যযুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

৩। ভারতের ইতিহাসে কোন্ সময়কে মধ্যযুগ বলা হয়? এই যুগ ভারতের ইতিহাসকে কি ভাবে প্রভাবিত করেছিল?

৪। ইউরোপ ও ভারতে সামন্তপ্রথার কাল নিয়ে আলোচনা কর।

৫। বিভিন্ন দেশে মধ্যযুগের গতি-প্রকৃতির বিভিন্ন রূপ দেখাও।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১। রোম সাম্রাজ্যের অবনতির কারণ দেখাও।

২। কাদের বর্বর বলা হত? তারা কি ভাবে রোমের সাম্রাজ্যে অনুপ্রবেশ করত?

৩। হূণদের সম্পর্কে কি জান? রোম ও রোম সাম্রাজ্য তাদের হাতে কি ভাবে বিধ্বস্ত হয়েছিল?

৪। বিভিন্ন জার্মান উপজাতির সমাজ, অর্থনীতি, প্রশাসন ও ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা কর।

৫। বর্বররা কি ভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে বসতিস্থাপন করেছিল? তাদের উপর সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব দেখাও।

৬। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও:

(ক) জার্মানদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল?

(খ রোম সাম্রাজ্য কখন বিভক্ত হয়েছিল?

(গ) অ্যালারিক কখন রোম আক্রমণ করেছিলেন?

(ঘ) গেনসেরিক কখন রোম ধ্বংস করেছিলেন?

(ঙ) পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতন কখন হয়েছিল?

৭। মানচিত্রের সাহায্যে জার্মানদের আদি বাসস্থান থেকে বিভিন্ন নতুন অঞ্চলে তাদের বসতিস্থাপন ও বিস্তার দেখাও।

৮। সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ:

(ক) অ্যালারিক, (খ) অ্যাটিলা, (গ) গেনসেরিক ও (ঘ) রোমুলাস অগাস্টালাস।

৯। ভুল সংশোধন কর:

(ক) জার্মানরা পূর্ব ইউরোপ থেকে এসেছিল।

(খ) হূণরা সংস্কৃতির অনুরাগী এবং শান্তিপ্রিয় ছিল।

(গ) ভ্যাণ্ডালরা উত্তর ইউরোপে বসতিস্থাপন করেছিল॥

(ঘ) রোমের সাম্রাজ্য ধ্বংসের সঙ্গে রোমের সংস্কৃতিও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল।

৯। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) —শতাব্দীতে—নেতা অ্যাটিলা বিভিন্ন শহর লুণ্ঠন করেছিলেন।

(খ) —খ্রীস্টাব্দে ভ্যাণ্ডালরা রোম আক্রমণ করেছিল।

(গ) —খ্রীস্টাব্দে রোমের সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছিল।

(ঘ) ঐতিহাসিক—লেখা থেকে জার্মানদের বিষয়ে জানা যায়।

তৃতীয় অধ্যায়

১। চতুর্থ থেকে সপ্তম খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ বলা কি সঙ্গত ?

২। শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ধর্মীয় সংস্থা ও ধর্মযাজকদের অবদান আলোচনা কর।

৩। মঠগুলি কি ভাবে শিক্ষাপ্রসারের জন্য কাজ করত ?

৪। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

(ক) সাধু বেনেডিক্ট কে ছিলেন ?

(খ) ক্যাসিওডোরাস কে ছিলেন ?

৫। সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ :

(ক) সাধু বেনেডিক্টের নিয়মাবলী ; (খ) মঠ ও সমাজের সেবা ; (গ) পাপ ও পুণ্যের ধারণা।

৬। ভুল সংশোধন কর :

(ক) মন্টি ক্যাসিনো একজন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন। (খ) জার্মান বর্বর রাজারা রাজকার্য পরিচালনার জন্য কাহারও সাহায্য নিতেন না। (গ) সাধু বেনেডিক্ট ১৫টি মঠ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। (ঘ) দুর্বল ও আর্তগণ চার্চে আশ্রয় পেত না। (ঙ) বর্বরদের নিজস্ব সংস্কৃতি ছিল না।

৭। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) খ্রীষ্টীয় - সভ্যতার আলো জেলে রেখেছিল। (খ) রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর – ছিল পশ্চিম ইউরোপীয় ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু। (গ) যাজক সম্প্রদায়ের একদল— রত থাকতেন। (ঘ) মঠের আবাসিকদের—আবশ্যকীয় ছিল। (ঙ) মঠগুলিকে প্রকৃত বিদ্যাচর্চার কেন্দ্রে পরিণত করলেন বেনেডিক্টের—।

চতুর্থ অধ্যায়

১। রোমান ও বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের ইতিহাসে সম্রাট বাইজান্টাইনের অবদান আলোচনা কর।

২। অবিভক্ত রোমান সাম্রাজ্য কি ভাবে দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছিল ? এর ফল কি হয়েছিল ?

৩। মানচিত্রের সাহায্যে দুই রোমান সাম্রাজ্য দেখাও।

৪। জাষ্টিনিয়ানের সাম্রাজ্যবাদ ও কার্যপদ্ধতি আলোচনা কর।

৫। জাষ্টিনিয়ানের আইন, স্থাপত্য ও চিত্রকলা সম্পর্কে কি জান ?

৬। সভ্যতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অবদান সম্পর্কে যা জান লেখ।

৭। সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ :

(ক) কনস্টানটাইন ; (খ) জাষ্টিনিয়ানের আইন ; (গ) সেণ্ট সোফিয়ার গীর্জা ; (ঘ) বাইজান্টাইন চিত্রকলা।

৮। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

(ক) বাইজান্টাইন রাজধানীর নাম কনস্টান্টিনোপল দেওয়া হয়েছিল কেন ? (খ) বোলিসারিয়াস কে ছিলেন ? (গ) সেণ্ট সোফিয়ার গীর্জা কার আনুকূল্যে নির্মিত হয়েছিল ?

৯। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) — খ্রীস্টাব্দে জাষ্টিনিয়ান সম্রাট হয়েছিলেন।

(খ) স্যালোনিকার গণিতজ্ঞ — যথেষ্ট খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন।

১০। ভুল সংশোধন কর :

(ক) সম্রাট কনস্টানটাইন খ্রীস্টধর্মের বিরোধী ছিলেন।

(খ) কর্পাস জুরিস নামে একটি ধর্মশাস্ত্র ছিল।

(গ) বাইজান্টাইন সভ্যতায় ধর্মের স্থান ছিল না।

পঞ্চম অধ্যায়

১। ইসলাম ধর্ম প্রবর্তিত হবার আগে আরব অঞ্চল ও তার জনসাধারণ সম্পর্কে কি জান ?

২। হজরত মহম্মদের জীবন ও বাণী আলোচনা কর।

৩। ইসলাম ধর্মের দ্রুত বিস্তারের কারণ দেখাও।

৪। খলিফাদের আমল বর্ণনা কর।

৫। ইসলামের স্পেন বিজয় ও শাসন সম্পর্কে কি জান ?

৬। আরব সভ্যতা ও সংস্কৃতির অবদান সম্পর্কে যা জান লেখ।

৭। সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ :

(ক) মুসলমানের কর্তব্য ; (খ) কারবালার শোকাবহ ঘটনা ; (গ) শিয়া ও সুন্নি সম্প্রদায় ; (ঘ) হারুণ অল রশিদ ; (ঙ) কর্ডোভা ; (চ) অল মামুন।

৮। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

(ক) খাদিজা কে ছিলেন ? (খ) হিজরা কাকে বলা হয় ? (গ) এজিদ কে ছিলেন ? (ঘ) ইবন বতুতা কেন প্রসিদ্ধ ছিলেন ?

৯। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) — দেবদূত-কর্তৃক আল্লার দূত বলে অভিহিত হয়েছিলেন। (খ) — 'জ্ঞানের আগার' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। (গ) — স্পেনীয় মুসলমান সভ্যতার বিশিষ্ট কেন্দ্র ছিল। (ঘ) — খ্রীস্টাব্দে ভিসিগথরা মুসলমানদের হাতে পরাজিত হয়েছিল।

১০। ভুল সংশোধন কর :

(ক) খলিফা ওমর বিলাসিতাপ্রিয় ছিলেন।

(খ) গ্রানাডা ও সেভিল নামে দুই মুসলমান সেনাপতি ছিলেন।

(গ) ইবন খলদুন ধর্মপ্রচারে সাফল্যলাভ করেছিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

১। ইউরোপের ইতিহাসে শার্লেমানের অবদান আলোচনা কর।

২। শার্লেমানের রাজ্যবিস্তার বর্ণনা কর। মানচিত্রের সাহায্যে শার্লেমানের সাম্রাজ্য দেখাও।

৩। শার্লেমানের অভিষেকের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

৪। শার্লেমানের আমলে রাষ্ট্র ও ধর্মের কি সম্পর্ক ছিল ?

৫। সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে শার্লেমানের অবদান সম্পর্কে যা জান লেখ।

৬। সংস্কৃতি রক্ষা ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে মঠগুলির ভূমিকা আলোচনা কর।

৭। মঠ-আন্দোলনের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা কর।

৮। মঠ-আন্দোলনের ত্রুটি ও অবদান বিশ্লেষণ কর।

৯। একাদশ শতাব্দীতে রাষ্ট্র ও ধর্মের সংঘাতের প্রকৃতি ও ফলাফল আলোচনা কর।

১০। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উৎপত্তি ও বিকাশ বর্ণনা কর।

১১। জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কি ভূমিকা ছিল ?

১২। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের চরিত্র ও ভূমিকা আলোচনা কর।

১৩। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

(ক) শার্লেমানের অভিষেক ; (খ) বেনেডিক্টপন্থী মঠ ; (গ) ক্লুনির ধর্ম-আন্দোলন ; (ঘ) বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষক-ছাত্র সম্পর্ক ; (ঙ) স্কুলমেন।

১৪। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

(ক) আইনহার্ড কে ছিলেন ? (খ) অ্যালকুইন কেন স্মরণীয় হয়ে আছেন ? (গ) স্যালেরনোর বিশ্ববিদ্যালয় কেন প্রসিদ্ধ ছিল ? (ঘ) এ্যাবেলার্ড কে ছিলেন ?

১৫। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) —খ্রীস্টাব্দে শার্লেমানের অভিষেক হয়েছিল। (খ) —শার্লেমানের জীবনী রচনা করেছিলেন। (গ) —নামে জনৈক মিশরীয় সাধু মঠ-আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। (ঘ) —খ্রীস্টাব্দে ক্লুনিক ধর্ম-আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। (ঙ) —খ্রীস্টাব্দে রাষ্ট্র ও ধর্মের সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল। (চ) রজার বেকন — গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

১৬। ভুল সংশোধন কর :

(ক) শার্লেমান পোপের দ্বারা পরিচালিত হতেন। (খ) রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করা ক্লুনির আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল। (গ) পোপ সপ্তম গ্রেগরী সম্রাটের প্রতি অনুগত ছিলেন। (ঘ) 'স্কুলমেন' গোষ্ঠী ধর্মে বিশ্বাস করতেন না।

সপ্তম অধ্যায়

১। সামন্তপ্রথার উৎপত্তি ও বিকাশ আলোচনা কর।

২। সামন্তপ্রথা কি ধরনের চুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল ?

৩। সামন্তসমাজে শ্রেণীবিভাগ বিশ্লেষণ কর।

৪। সামন্তপ্রথার ভূমিকা ও অবদান বিশ্লেষণ কর।

৫। কি কি কারণে সামন্তপ্রথার অবনতি হয়েছিল ?

৬। 'শিভালরি' সম্পর্কে কি জান ?

৭। কি করে নাইট হওয়া যেত ?

৮। নাইটের কি কি কর্তব্য ছিল ?

৯। ত্রোবাদুর অথবা চারণ কবির কি ভূমিকা ছিল ?

১০। ম্যানরপ্রথার উৎপত্তি ও উদ্দেশ্য আলোচনা কর।

১১। ম্যানরপ্রথায় সামন্তদের কি কি ক্ষমতা ও সুবিধা ছিল ?

১২। ম্যানরপ্রথায় সামাজিক শ্রেণীবিভাগ দেখাও।

১৩। ম্যানরপ্রথায় চার্চ কি ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল ?

১৪। ভূমিদাসের কঠোর জীবনযাত্রা বর্ণনা কর। তাদের অবস্থা কি সবচেয়ে শোচনীয় ছিল ?

১৫। ভূমিদাসরা পালাবার জন্য কি কি উপায়ের আশ্রয় নিত ?

১৬। সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ :

(ক) সামন্তপ্রথার চুক্তি ; (খ) কৃষি অর্থনীতি ; (গ) শিভালরি ; (ঘ) নাইট ; (ঙ) 'ম্যানর হাউস' অথবা সামন্ত প্রভুর প্রাসাদ।

১৭। সংক্ষিপ্ত উত্তর লেখ :

(ক) 'ভ্যাসাল' (vassal) কাকে বলা হত ? (খ) 'ভিলেন' (villain) কাকে বলা হত ? (গ) 'স্কোয়ার' (squire) কাকে বলা হত ?

১৮। ভুল সংশোধন কর :

(ক) সামন্তপ্রথা ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। (খ) নাইটরা অরাজকতার সৃষ্টি করতেন। (গ) ভূমিদাসদের অবস্থা ভাল ছিল। (গ) ভূমিদাসদের পালাবার কোন উপায় ছিল না।

অষ্টম অধ্যায়

১। ধর্মযুদ্ধ কেন হয়েছিল ?

২। ধর্মযোদ্ধাদের কি কি উদ্দেশ্য ছিল ?

৩। ধর্মযুদ্ধগুলির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

৪। ধর্মযুদ্ধের ফল আলোচনা কর।

৫। ধর্মযুদ্ধ কি ভাবে বাণিজ্যের প্রসার ঘটিয়েছিল—এই প্রসঙ্গে ইটালীয় শহরগুলির ভূমিকা দেখাও।

৬। ধর্মযুদ্ধে অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

৭। সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ :

(ক) ধর্মযুদ্ধে পোপের ভূমিকা ; (খ) জেরুজালেমের ল্যাটিন রাজ্য ; (গ) ধর্মযুদ্ধের রাজনৈতিক ফল ; (ঘ) ধর্মযুদ্ধের সাংস্কৃতিক ফল।

৮। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) প্রথম ধর্মযুদ্ধ—খ্রীস্টাব্দে হয়েছিল। (খ) দ্বিতীয় ধর্মযুদ্ধ—খ্রীস্টাব্দে হয়েছিল। (গ) তৃতীয় ধর্মযুদ্ধ—খ্রীস্টাব্দে হয়েছিল। (ঘ) চতুর্থ ধর্মযুদ্ধ—খ্রীস্টাব্দে হয়েছিল। (ঙ) পঞ্চম ধর্মযুদ্ধ — খ্রীস্টাব্দে হয়েছিল। (চ) ষষ্ঠ ধর্মযুদ্ধ — খ্রীস্টাব্দে হয়েছিল।

৯। ভুল সংশোধন কর :

(ক) ধর্মযুদ্ধে পোপের আগ্রহ ছিল না। (খ) ধর্মযুদ্ধে শহরগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। (গ) ধর্মযুদ্ধে সামন্তপ্রথা শক্তিশালী হয়েছিল।

নবম অধ্যায়

১। শহরগুলির উৎপত্তি ও বিকাশের কারণ আলোচনা কর।

২। গিল্ডপ্রথা কি ভাবে গড়ে উঠেছিল ? এই প্রথার কি ভূমিকা ছিল ?

৩। নাগরিক জীবনযাত্রা সম্পর্কে কি জান ?

৪। নাগরিক স্বায়ত্তশাসনের ইতিহাস বর্ণনা কর।

৫। বুর্জোয়া সম্প্রদায় সম্পর্কে কি জান ?

৬। বিভিন্ন ক্ষেত্রে শহরগুলির অবদান দেখাও।

৭। মানচিত্রের সাহায্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহর নির্দেশ কর।

৮। সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ : (ক) বার্গ ; (খ) গিল্ড ; (গ) বুর্জোয়া।

৯। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

(ক) স্বায়ত্তশাসন বলতে কি বোঝ ?

(খ) শহরে কারা বাস করত ?

১০। ভুল সংশোধন কর :

(ক) শহরগুলিতে কৃষকেরা বাস করত। (খ) রাজশক্তি শহরগুলিকে পরিচালিত করত। (গ) বুর্জোয়া গোষ্ঠী দরিদ্র ছিল।

দশম অধ্যায়

১। তাঙ বংশের উল্লেখযোগ্য রাজাদের কথা আলোচনা কর।

২। তাঙ যুগে চীনে সব ক্ষেত্রের অগ্রগতি বর্ণনা কর।

৩। সুঙ যুগের উল্লেখযোগ্য রাজা ও প্রশাসকদের কৃতিত্ব দেখাও।

৪। সুঙ যুগে সাধারণ মানুষের মঙ্গলের জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল ?

৫। সুঙ যুগে সভ্যতা ও সংস্কৃতির অগ্রগতি আলোচনা কর।

৬। মোঙ্গলরা কি ভাবে চীনে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিল ?

৭। কুবলাই খান সম্পর্কে কি জান ?

৮। মানচিত্রের সাহায্যে কুবলাই খানের সাম্রাজ্য নির্দেশ কর।

৯। মার্কোপোলোর বৃত্তান্ত থেকে কি জানতে পার ?

১০। মানচিত্রের সাহায্যে মার্কোপোলোর ভ্রমণপথ দেখাও।

১১। সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ :

(ক) তাই সুঙ ; (খ) হিউ-এন সাঙ ; (গ) ওয়াঙ-আন-সি : (ঘ) কুবলাই খান ; (ঙ) মার্কোপোলো।

১২। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

(ক) তাঙ বংশের সময় বল। (খ) লি-উয়ান কে ছিলেন ? (গ) তাই সুঙ কে ছিলেন ? (ঘ) মিঙ হুয়াঙ কে ছিলেন ? (ঙ) হিউ-এন সাঙ কে ছিলেন ? (চ) সুঙ বংশের সময় বল। (ছ) ওয়াঙ-আন-সি কে ছিলেন ? (জ) ওগতাই কে ছিলেন ? (ঝ) নিকোলোপোলো কে ছিলেন ?

১৩। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) — কে তাঙ বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা বলা হয়। (খ) — এর রাজত্বকালে

— নামে এক রাজকর্মচারী বিদ্রোহ করেন। (গ) — যুগে চীনের সংস্কৃতি বিভিন্ন দেশে প্রসারিত হয়েছিল। (ঘ) — তাঙ যুগের একজন প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী। (ঙ) — চীনে মোঙ্গল আধিপত্যের সূচনা করেছিলেন। (চ) মার্কোপোলো — থেকে চীনে গিয়েছিলেন।

১৪। ভুল সংশোধন কর :

(ক) হিউ-এন সাঙ সুঙ যুগের লোক ছিলেন। (খ) সুঙ যুগে যন্ত্র প্রচলিত হয়েছিল। (গ) জুকেন জাতি শান্তিপ্রিয় ছিল। (ঘ) চেঙ্গিস খাঁ যুদ্ধে অপটু ছিলেন। (ঙ) ওগতাই চীন থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। (চ) কুবলাই খান মুসলমান ছিলেন।

একাদশ অধ্যায়

১। জাপানের সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে চীনের প্রভাব আলোচনা কর।

২। জাপানের রাজতন্ত্রের প্রকৃতি ও ক্ষমতা সম্পর্কে কি জান ?

৩। জাপানের ইতিহাসে সামন্তপ্রথার ভূমিকা আলোচনা কর।

৪। শোগুনের পদের উৎপত্তি কিভাবে হয়েছিল ? শোগুনের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

৫। জাপানের সমাজে শ্রেণীবিভাগ দেখাও।

৬। সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ :

(ক) তাইকা সংস্কার ; (খ) নারা ; (গ) শিন্টোধর্ম ; (ঘ) বৌদ্ধধর্ম ; (ঙ) ফুজিওয়ারা গোষ্ঠী ; (চ) হেইআন যুগ ; (ছ) ইউরিটোমো ; (জ) শোগুন ; (ঝ) সামুরাই ; (ঞ) বুসিডো।

৭। সংক্ষিপ্ত উত্তর লেখ :

(ক) সোটুকু টাইসি কি বলেছিলেন ? (খ) কুজি কাকে বলা হত ? (গ) কাম্মু কে ছিলেন ? (ঘ) কামাকুরা কি ? (ঙ) ডাইমিও কি ? (চ) বাইসিন কি ?

৮। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) —শতাব্দীতে জাপানে প্রথম স্থায়ী রাজধানী—নির্মিত হয়েছিল। (খ) — খ্রীস্টাব্দে — বৌদ্ধধর্ম — থেকে জাপানে এসেছিল। (গ) সম্রাট — তে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। (ঘ) শোগুন — কাছ থেকে — পদে নিযুক্ত হলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

১। হূণদের ভারত আক্রমণের ইতিহাস বর্ণনা কর।

২। হূণদের আক্রমণের ঐতিহাসিক গুরুত্ব আলোচনা কর।

৩। যোদ্ধা, শাসক এবং ধর্ম ও সংস্কৃতির অনুরাগী হিসেবে হর্ষবর্ধনের পরিচয় দাও।

৪। হিউ-এন-সাঙের বিবরণ সম্বন্ধে কি জান ? মানচিত্রের সাহায্যে তাঁর ভারতে আসা এবং ভারত থেকে ফেরার পথ নির্দেশ কর।

৫। নালন্দা মহাবিহারের বিবরণ দাও।

৬। কোন্ সময়কে রাজপুত যুগ বলা হয় ? এই যুগের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

৭। ত্রিপাক্ষিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ইতিহাস বর্ণনা কর।

৮। বাংলার ইতিহাসে শশাঙ্কের গুরুত্ব আলোচনা কর।

৯। পাল ও সেন যুগে বাংলার সমাজ সম্বন্ধে কি জান ?

১০। পাল যুগের ধর্ম ও সংস্কৃতি আলোচনা কর।

১১। পাল যুগের বিভিন্ন বিহার ও শিক্ষাকেন্দ্র সম্বন্ধে কি জান ?

১২। সেন যুগের ধর্ম ও সংস্কৃতি আলোচনা কর।

১৩। পল্লব বংশের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা কর। শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পল্লবদের অবদান দেখাও।

১৪। চালুক্য বংশের কীর্তির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা কর।

১৫। সমুদ্রপথে চোল বংশের কৃতিত্ব সম্বন্ধে কি জান ?

১৬। সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ :

(ক) স্কন্দগুপ্ত ; (খ) তোরমান ; (গ) মিহিরকুল ; (ঘ) যশোধর্মন ; (ঙ) প্রভাকর বর্ধন ; (চ) রাজ্যবর্ধন ; (ছ) গ্রহবর্মণ ; (জ) রাজ্যশ্রী ; (ঝ) হিউ-এন-সাঙ ; (ঞ) নালন্দা ; (ট) শশাঙ্ক ; (ঠ) বিক্রমশীলা ; (ড) উদন্তপুর ; (ঢ) পল্লব বংশ ; (ণ) চালুক্য বংশ ; (ত) রাজেন্দ্র চোল।

১৭। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও :

(ক) কোন্ কোন্ গুপ্ত রাজা হূণদের হারিয়েছিলেন ?

(খ) হূণদের দুই নেতার নাম কর। (গ) গুপ্ত যুগের পর উত্তর ভারতে উল্লেখযোগ্য রাজ্যগুলির নাম কর। (ঘ) প্রভাকর বর্ধন কে ছিলেন ? (ঙ) রাজ্যবর্ধন কে ছিলেন ? (চ) দেবগুপ্ত কে ছিলেন ? (ছ) গ্রহবর্মণ কে ছিলেন ? (জ) রাজ্যশ্রী কে ছিলেন ? (ঝ) হর্ষের রাজত্বকাল কত শতাব্দী থেকে কত শতাব্দী পর্যন্ত ? (ঞ) বাণভট্ট কে ছিলেন ? (ট) শীলভদ্র কে ছিলেন ? (ঠ) বালপুত্র দেব কে ছিলেন ? (ড) ধর্মপাল কে ছিলেন ? (ঢ) মিহির ভোজ কে ছিলেন ? (ণ) শশাঙ্কের রাজত্বকাল কোন্ সময় থেকে কোন্ সময় পর্যন্ত ? (ত) কুলীনপ্রথা কি ? (থ) সন্ধ্যাকর নন্দী কে ছিলেন ? (দ) হলায়ুধ কে ছিলেন ? (ধ) নরসিংহ বর্মণ কে ছিলেন ? (ন) দ্বিতীয় পুলকেশী কে ছিলেন ? (প) প্রথম বিক্রমাদিত্য কে ছিলেন ? (ফ) প্রথম রাজরাজ কে ছিলেন ? (ব) দ্বিতীয় রাজেন্দ্র কে ছিলেন ?

১৮। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) — ও — হূণদের নেতা ছিলেন। (খ) ভানুগুপ্ত — কে পরাজিত ও বন্দী করলেন। (গ) — রাজ্যশ্রীকে কারারুদ্ধ করেছিলেন। (ঘ) বল্লভীর — হর্ষ-কর্তৃক পরাজিত হয়েছিলেন। (ঙ) হর্ষ — নামে তিনটি নাটক রচনা করেছিলেন। (চ) হিউ-এন-সাঙ — বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। (ছ) তিব্বতের রাজা — কনৌজের শাসক — কে বন্দী করেছিলেন। (জ) রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব — কে পরাজিত করেন। (ঝ) তৃতীয় ইন্দ্র — কে পরাজিত করেছিলেন। (ঞ) সম্ভবত শশাঙ্ক — সামন্ত ছিলেন। (ট) গোপালদেব — সূচনা করেছিলেন। (ঠ) হেমন্তসেনের ছেলে — সেনগৌরবের সূচনা করেছিলেন। (ড) বিজয়-সেনের ছেলের নাম —। (ঢ) লক্ষ্মণসেন — আক্রমণের ফলে পূর্ববাংলায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। (ণ) রাজা — কনৌজ থেকে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে নিয়ে এসেছিলেন। (ত) ধর্মপাল বৌদ্ধ লেখক — কে সম্মান করতেন। (থ) চক্রপাণি দত্ত — লিখেছিলেন। (দ) অতীশ দীপঙ্কর — মহাবিহারের জ্ঞানচর্চা করেছিলেন। (ধ) বল্লাল সেনের গুরুর নাম —। (ন) ধোয়ী — রচনা করেছিলেন। (প) জয়দেব — রচনা করেছিলেন। ফ) পল্লবরাজ — দ্বিতীয় পুলকেশীর হাতে পরাজিত হয়েছিলেন। (ব) রাষ্ট্রকূটরাজ — পল্লবরাজ — কে পরাজিত করেছিলেন। (ভ) ভারবি — রচনা করেছিলেন। (ম) পল্লবরাজ — কর্তৃক চালুক্যরাজ — পরাজিত ও নিহত হয়েছিলেন। (য) রাষ্ট্রকূটরাজ — চালুক্যরাজ — কে পরাজিত করেছিলেন

ত্রয়োদশ অধ্যায়

১। মধ্য এশিয়াতে ভারতের সাংস্কৃতিক প্রভাব দেখাও।

২। চীন ও তিব্বতে ভারতের সাংস্কৃতিক প্রভাব আলোচনা কর।

৩। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির উপর ভারতের সাংস্কৃতিক প্রভাব আলোচনা কর।

৪। সংক্ষিপ্ত উত্তর লেখ :

(ক) কম্বোজে ভারতীয় সংস্কৃতির সম্পর্কে কি জান ?
(খ) চম্পার উপর ভারতীয় সভ্যতার প্রভাব দেখাও।
(গ) শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য সম্পর্কে কি জান ?
(ঘ) যবদ্বীপে ভারতীয় প্রভাব দেখাও।
(ঙ) সুমাত্রা কি ভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাবে এসেছিল ?
(চ) বলি দ্বীপে ভারতীয় প্রভাব দেখাও।

৫। সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ :

(ক) খোটান; (খ) কাশ্যপ মাতঙ্গ; (গ) অতীশ দীপঙ্কর; (ঘ) অঙ্কোরবাত; (ঙ) কুমার ঘোষ; (চ) বালপুত্রদেব; (ছ) বোরোবুদুর।

৬। ভুল সংশোধন কর :

(ক) কণিষ্ক মধ্য এশিয়াতে হিন্দুধর্ম প্রচার করেছিলেন।

(খ) অতীশ দীপঙ্কর চীনে গিয়েছিলেন।

(গ) অঙ্কোরবাতের বৌদ্ধ মন্দির বিখ্যাত ছিল।

(ঘ) বোরোবুদুরের বিষ্ণুমন্দির চম্পার গৌরবের নিদর্শন।

৭। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) কুষাণ যুগে — ভারতীয় উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। (খ) খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে — চীনে গিয়েছিলেন। (গ) তিব্বতের রাজা — বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। (ঘ) কম্বোজের প্রাচীন হিন্দুরাজ্যের নাম ছিল —। (ঙ) কুমার ঘোষের নির্দেশে — মন্দির নির্মিত হয়েছিল। (চ) সুমাত্রার হিন্দু রাজ্যগুলির নাম ছিল —।

চতুর্দশ অধ্যায়

১। ভারতে মুসলমান আক্রমণ ও রাজ্য প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বর্ণনা কর।

২। সুলতানী আমলে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

৩। হিন্দুধর্ম ও ইসলামের সমন্বয় সম্বন্ধে কি জান ?

৪। ভক্তিবাদ কি ? কয়েকজন উল্লেখযোগ্য সাধকের কাজ দেখাও।

৫। ইলিয়াস শাহ এবং হুসেন শাহের আমলে বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বর্ণনা কর।

৬। সুলতানী প্রশাসন সম্বন্ধে কি জান ?

৭। সংক্ষিপ্ত উত্তর লেখ :

(ক) ভারত আক্রমণে মুসলমানদের উদ্দেশ্য দেখাও।

(খ) সুলতানী আমলে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা কি রকম ছিল ?

(গ) সুলতানী আমলে শিল্প সম্বন্ধে কি জান ?

৮। টীকা লেখ :

(ক) সবুক্তগীন ; (খ) মহম্মদ ঘোরী ; (গ) কুতুবউদ্দীন ; (ঘ) ইলতুৎমিস ; (ঙ) বলবন ; (চ) আলাউদ্দীন খলজী ; (ছ) মহম্মদ-বিন-তুঘলক ; (জ) ফিরোজ তুঘলক ; (ঝ) কবীর ; (ঞ) নানক ; (ট) শ্রীচৈতন্য ; (ঠ) ইলিয়াস শাহ ; (ড) হুসেন শাহ।

৯। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) কুতুবউদ্দীন — খ্রীস্টাব্দে সুলতানী বংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

(খ) —খ্রীস্টাব্দে সুলতানী বংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

(গ) ভক্তিবাদ — মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করেছিল।

১০। ভুল সংশোধন কর :

(ক) সুলতান মামুদ রাজ্যবিস্তারের উদ্দেশ্যে ভারতে এসেছিলেন।

খ) ইলতুৎমিস মোঙ্গলদের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন।

(গ) বলবন দুর্বল সুলতান ছিলেন।

(ঘ) ফিরোজ তুঘলক রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়

১। পঞ্চদশ শতাব্দীর নবজাগরণের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

২। কি ভাবে নবজাগরণের সূচনা হয়েছিল ?

৩। ভাস্কো-ডা-গামা কি ভাবে ভারতে এসেছিলেন ?

৪। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) ১৪৫৩ খ্রীস্টাব্দে — আক্রমণে কনস্টান্টিনোপল তথা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের পতন — অবসানকে সম্পূর্ণ করল।

(খ) — আমেরিকা আবিষ্কার করেন।

(গ) ইংল্যাণ্ডে — বংশ এবং ফ্রান্সে—বংশ যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল।

(ঘ) নেদারল্যাণ্ড স্পেনের রাজা দ্বিতীয় — বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন।

(ঙ) ইংলণ্ডের রাজার সঙ্গে — বিরোধ চরম পর্যায়ে গিয়েছিল।

৫। সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ :

(ক) কনস্টান্টিনোপলের পতন ;

(খ) হিউম্যানিস্ট ;

(গ) ভৌগোলিক প্রসারের ফল ;

(ঘ) নতুন রাজতন্ত্র।

৬। ভুল সংশোধন কর :

(ক) খ্রীস্টীয় চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রাচীন যুগের অবসান ও আধুনিক যুগের সূচনা হতে থাকে।

(খ) শিল্প ও সাহিত্য ধর্মকে বেশি প্রাধান্য দেবার জন্য তাঁদের হিউম্যানিস্ট বলা হত।

(গ) ইংল্যাণ্ডের রাজার সঙ্গে পার্লামেণ্টের কোন বিরোধ ছিল না।